পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৭ বর্ষ ॥ ১৯ ও ২০শ সংখ্যা

২৬শে যিলকদ, ১৪১৬ হিঃ ॥ ২রা বৈশাখ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১

হাদীস শরীফ ঃ
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ ৪

অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ৫

হাকিকাতুল ওহী
মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)
অনুবাদ : জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া ৭

জুমুআর খুৎবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ ১৩

ঈদুল আযহিয়ার খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
অনুবাদ : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ২২

কুরবানী সম্পর্কে কতিপয় জরুরী কথা
সংকলন : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক ৪১

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে— ৪৫

শান্তির যুবরাজ
আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী ৪৭

চলতি দুনিয়ার হালচাল ঃ নদীর দাব্যতা ও মানুষের নৈতিক অধঃগতি
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী ৪৯

হে বান্দা ! (কবিতা)
জনাব আহমদ সেলবর্ষী ৫০

আহ্‌মদীয়া তবলীগী পকেট বুক
মূঃ : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৫১

এম, টি, এ ডাইজেস্ট
সংকলন—জনাব আবদুল্লাহ্‌ শামস্‌ বিন তারিক ৬৩

ছোটদের পাতা
পরিচালক : জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৬৫

সংবাদ ৬৭

আস্‌হাবে কাহাফের পাতা ৬৯

আররকীম ৭১

সম্পাদকীয় ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৭তম বর্ষ : ১৯ ও ২০শ সংখ্যা

১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ : ১৫ই শাহাদত, ১৩৭৫ হিঃ শামসী : ২রা বৈশাখ, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আস্ সাফ্‌ফাত-৩৭

১০১। (সে বলিল,) 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সৎ ও সৎকর্মশীল পুত্র দাও।'

১০২। তখন আমরা তাঁহাকে এক ধৈর্যশীল, প্রতিভাবান পুত্রের সুসংবাদ দিলাম।

১০৩। অতঃপর যখন সেই পুত্র তাহার সহিত দৌড়াইবার বয়সে উপনীত হইল তখন সে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে যবাই করিতেছি; (২৪৯৭) সুতরাং তুমি চিন্তা কর, তোমার কী অভিমত?'

২৪৯৭। আল্লাহ্‌তা'লার আদেশক্রমে ইব্‌রাহীম (আঃ) কাহাকে কুরবানীরূপে পেশ করিয়াছিলেন—ইসমাঈলকে না ইস্‌হাককে—এই বিষয়ে কুরআন ও বাইবেলে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বাইবেলের মতে কুরবানীর পাত্র ছিলেন ইস্‌হাক (আঃ) (আদি পুস্তক-২২:২)। এই ব্যাপারে বাইবেলে পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। বাইবেল বলে 'আব্রাহামকে' আদেশ করা হইয়াছিল, তাঁহার একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করিতে, কিন্তু ইস্‌হাক (আঃ) কোন কালেই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন না। ইস্‌হাকের (আঃ) চাইতে ইসমাঈল (আঃ) ১৩ বৎসরের বড় এবং এই ১৩ বৎসর তিনি ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র ছিলেন। প্রথম পুত্র ও একমাত্র সন্তান হিসাবে তিনি পিতার কাছে অত্যধিক আদরের ছিলেন। অতএব, ইহাই যুক্তি-যুক্ত যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্র, একমাত্র পুত্র ইসমাঈলকেই (আঃ) কুরবানী করার আদেশ দিয়াছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের কেহ কেহ অনর্থক বলিয়া থাকেন যে, ইসমাঈল দাসীর পুত্র হওয়াতে তাঁহার মাঝে রক্ত-মাংসের (কামনা-বাসনার) আধিক্য ছিল এবং ইস্‌হাক স্বাধীন রমনীর সন্তান হওয়াতে, তিনিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুত পবিত্র সন্তান (গালাতীয় ৪:২২-২৩)। একথা মোটেই সত্য নয় যে, হযরত ইসমাঈলের মা হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন। তাই বাইবেলে আমরা দেখিতে পাই যে, হযরত ইসমাঈলকে বারংবার

১০৪। অতঃপর যখন তাহারা উভয়ই (আল্লাহ্‌র সমীপে) আত্মসমর্পণ করিল এবং সে তাহাকে যবাই করার জন্য কপালের উপর উপুড় করিয়া শোয়াইল;

১০৫। তখন আমরা তাহাকে ডাক দিলাম যে, 'হে ইব্রাহীম!

১০৬। তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করিয়াছ।' নিশ্চয় আমরা এইরূপেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি।

১০৭। নিশ্চয় ইহা এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

ইব্‌রাহীমের (আঃ) পুত্র বলা হইয়াছে যেইরূপ ইস্‌হাককে (আঃ) বলা হইয়াছে (আদি পুস্তক-১৬:১৬; ১৭:২৩, ২৫)। তাহা ছাড়া একই ধরনের 'বিরাট-ভবিষ্যতের' প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে ইসমাঈল ও ইস্‌হাক উভয়ের জন্যই (আদি পুস্তক-১৬:১০, ১১, ১৭:২০)।

বাইবেলে 'মারওয়া' পাহাড় মোরিয়া বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং ইসমাঈল নামের স্থলে ইস্‌হাক বসানো হইয়াছে। 'মারওয়া' মক্কার অদূরে একটি পাহাড়, যেখানে ইব্‌রাহীম (আঃ) তদীয় শিশু-পুত্র ইসমাঈলসহ হাজেরাকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। 'মারওয়া' স্থলে 'মোরিয়া' আর ইসমাঈলের স্থলে ইস্‌হাক এই দুই শব্দ বদল ব্যতীত বাইবেলে সমর্থনের নিমিত্ত আর কোন কিছু নাই যদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ইস্‌হাকই ছিলেন কুরবানীকৃত পুত্র, ইসমাঈল নহেন। প্রনিধানযোগ্য বিষয় হইল, ইস্‌হাককেই কুরবানী দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইহুদী ও খৃষ্টানগণ মনে করিলেও তাহাদের কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে এতবড় একটা ঘটনার কোন চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয় না। তাহারা যাহা বলে তাহা যদি সত্যই হইত তাহা হইলে তাহারা এত মাহাত্ম্যপূর্ণ ঘটনাটা বিস্মৃত হইত না; কোন না কোনভাবে তাহা ধর্মাচারে জাগরূক থাকিত। অপর দিকে হযরত ইসমাঈলের আধ্যাত্মিক সন্তান মুসলমানেরা বহু উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে, ইসমাঈলের ঐ কুরবানীর কথা স্মরণ করে এবং নিজেরা পশু কুরবানী করিয়া যিলহজ্জ মাসের দশম দিনে সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া জাগাইয়া তোলে। মুসলমান কর্তৃক দুম্বা, ছাগল ইত্যাদি কুরবানী করার এই সার্বজনীন ধর্মীয় আচার বিতর্কের উর্ধ্বে এবং প্রমাণ করে যে, হযরত ইব্‌রাহীম কুরবানীর জন্য ইস্‌হাককে নয় বরং ইসমাঈলকে পেশ করিয়াছিলেন। ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে তাঁহার স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী একেবারে আক্ষরিকভাবে পালন করিতে হয় নাই, যদিও তিনি ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) আক্ষরিকভাবে উহা পালন করিতেই প্রস্তুত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্ন-দৃষ্ট কুরবানী তখনই এক হিসাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্ত্রী হাজেরা ও শিশু-পুত্র ইসমাঈলকে মক্কার ধূঁধূঁ উপত্যকায় আশ্রয়হীন অবস্থায় ছাড়িয়া গিয়াছিলেন।

১০৮। এবং আমরা এক মহা কুরবানীর দ্বারা তাহার ফিদিয়া (মুক্তি-পণ) দিয়াছিলাম। (২৪৯৮)

১০৯। এবং আমরা পরবর্তীগণের মধ্যে তাহাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠা করিলাম। (২৪৯৯)

১১০। ইব্‌রাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হউক।

১১২। নিশ্চয় সে আমাদের মো'মেন বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই যে, বীরত্বের কার্য, ইহারই মাঝে হযরত ইসমাঈলের কুরবানীর চিহ্ন ও প্রতীক রহিয়াছে। প্রথমে ইবরাহীমের (আঃ) প্রতি আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ যে, নিজ পুত্রকে কুরবানী কর এবং কুরবানীর মুহূর্তকাল পূর্বে এই নির্দেশ যে, থাম। হুকুম পালন করা হইয়া গিয়াছে—এই দুই নির্দেশের মধ্যে উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, এখন হইতে মানুষ কুরবানী নিষিদ্ধ করা হইল। কেননা, এই অমানবিক নরহত্যা ধর্মের নামে বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে তখন প্রচলিত ছিল।

২৪৯৮। ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী দেওয়ার ব্যাপারে ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর অবিচল নিষ্ঠা ও পুত্র ইসমাঈলের অটল সংকল্প ও প্রস্তুতি, মানবেতিহাসে চিরস্মরণীয় করার জন্য, হজ্জব্রত পালনের অঙ্গ হিসাবে পশু কুরবানী করাকে একটি ইসলামী অনুষ্ঠানের রূপ দেওয়া হইয়াছে। আয়াতটিতে আরও বুঝা যায় যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সময় নরবলী দেওয়ার যে প্রচলন ছিল, তাহা পশু কুরবানীতে বদলাইয়া দেওয়া হইল।

২৪৯৯। ইহার চেয়ে বড় সাক্ষ্য ইবরাহীম (আঃ)-এর মাহাত্ম্যের জন্য আর কি হইতে পারে যে, তিন তিনটি বড় বড় ধর্মের অনুসারীরা তাঁহাকে আপন পিতৃপুরুষ মানিয়া গৌরব বোধ করে। এই তিনটি ধর্ম হইল ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদী ধর্ম।

(৪র্থ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মুসলমানের উপর ফরয। আজ সমাজের দিকে তাকালে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, হালাল উপার্জন করতে হলে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ইসলাম যেহেতু পৃথিবীর সকল জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন করতে এসেছে তাই ইসলাম স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছে আগে পরিশ্রম করে নিজেদের পরিবর্তন কর তাহলে খোদা তোমাদের জন্যে এগিয়ে আসবেন।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাঁর উম্মতকে জানিয়ে দিচ্ছেন ফযরের নামাযের পর ঘুমিয়ে রিযিককে স্বল্প করা না। অলসতা কর না বরং সকালেই পরিশ্রমের জন্য বেরিয়ে পর যাতে হালাল জীবিকা উপার্জন করতে পারো। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সবাইকে হালাল জীবিকা উপার্জনের তৌফীক দান করুন। আমীন।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

কুরআন ঃ

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم (رعد ايت ١٢)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ কখনও কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের পরিবর্তন করে। (সুরা রা'দ, আয়াত—১২)

হাদীস ঃ

طلب كسب الحلال فريضة بعد فريضة.....اذا صليتم الفجر فلا تنوامو عن طلب ارزاقكم (كنزل العمال)

অর্থাৎ ফরয নামাযের বাধ্য বাধকতার পর হালাল উপার্জন প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয.....ফজরের নামাযের পর তোমরা ঘুমিও না বরং রিযিক উপার্জনে নেমে পর।

(কানযুল উম্মাল)

ব্যাখ্যা ঃ—মেহনত অর্থাৎ পরিশ্রম এক মহৎ গুণ। পরিশ্রম করার গুণ যে জাতির বৈশিষ্ট্য তাদের কেউ দমিয়ে রাখতে পারে না। তাদের মাথা সম্মানের পতাকাবাহী। কুরআন শরীফের আয়াত আমাদের অবগত করছে কোন জাতির ভাগ্যের পরিবর্তন পরিশ্রম ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। ইসলাম পরিশ্রম করাকে বড় মাপের গুণ বলে চিহ্নিত করেছে এবং পরিশ্রম করার জন্য যেখানে উদ্বুদ্ধ করেছে সেখানে পরিশ্রমের মর্যাদাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছে।

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ নেই তার উপর কোন দায়িত্ব অর্পণ করা যায় না। আর তা হলো সততা, পরিশ্রম ও জ্ঞান।

(মলফুযাত, নবম খণ্ড, ৩৫৪ পৃঃ)

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে জানিয়েছেন খোদার নৈকট্যপ্রাপ্তদের মধ্যে এই গুণাবলী পাওয়া আবশ্যকীয়। হযরত আদম (আঃ) হতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর জীবনে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, উপরোক্ত গুণাবলী সকলের মাঝেই বিদ্যমান ছিল।

ইসলামের শিক্ষা অলসতা পরিহার করে পরিশ্রমী হওয়া। উম্মতে মুহাম্মদীয়াকে বলা হচ্ছে পরিশ্রমী হও নতুবা হালাল উপার্জন করতে পারবে না। হালাল উপার্জন প্রত্যেক

(অবশিষ্টাংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরব্বী

"শেখ সা'দী লিখেছেন যে, একবার এক বাদশাহ মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লো। সে বললো, আমার জন্য দোয়া করুন যেন করুণাময় আল্লাহ্‌ আমাকে আরোগ্য দান করেন। তখন আমি উত্তর দিলাম যে, আপনার জেলখানায় সহস্র সহস্র নিরপরাধ কয়েদী থাকতে পারে যাদের বদদোয়ার মোকাবেলায় আমার দোয়া কীভাবে গ্রহণ হতে পারে? তখন বাদশাহ কয়েদীদিগকে মুক্ত করে দিলেন, ফলে বাদশাহ সুস্থ হয়ে গেলেন। খোদার বান্দাদের উপর রহম করা হলে খোদাও রহম করেন। যারা অন্যের উপর রহম করেন তাদের উপর আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলও রহম করেন। অন্যদের সাথে অন্যায় আচরণ করা, অন্যায়ভাবে ধন-সম্পদ একত্র করা এবং মাল ও আসবাবের উপরেই পড়ে থাকা বড়ই গর্হিত বিষয়।"

"যদিও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, কিন্তু যেহেতু গাফিলতি লেগেই আছে, একদিকে আদেশ উপদেশ শ্রবণ করা হয় এবং মনে তাকওয়া লাভের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় কিন্তু তথাপি গাফিলতি হয়ে যায়, তাই আমার জামা'তকে সদা স্মরণ রাখা উচিত যে, আল্লাহ্‌কে যেন কোন ক্রমেই ভুলে না যায়। সর্বদা তাঁরই নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকা উচিত, তিনি ব্যতিরেকে মানুষ কিছুই নয়। ভালরূপে স্মরণ রেখো যে, তিনি নিমিষে নস্যাৎ করে দিতে পারেন। নানা আপদ-বিপদ ও দুঃখ যাতনা রয়েছে, কখনো নির্ভয় ও নির্ভীক হওয়ার ইহা স্থান নয়। এ দুনিয়াতেও জাহান্নাম সৃষ্টি হতে পারে এবং ভয়াবহ বিপদাবলী আসতে পারে। ভাল করে স্মরণ রাখা উচিত যে, বিপদে কেহই আসতে পারে না এবং সহানুভূতিতে অংশ নিতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌ স্বয়ং সাহায্য সহায়তা করেন এবং নিজ ফযল দ্বারা স্বয়ং বিপদকে দূরীভূত করেন। তাই প্রত্যেকের উচিত যেন খোদার সঙ্গে তার একটা গুপ্ত সম্পর্ক থাকে।

যে ব্যক্তি দুঃসাহসিকতার সাথে অন্যায় ও দুষ্কর্মে এবং পাপে ব্যাপ্ত থাকে সে এক মহাবিপদাপন্ন অবস্থায় অবস্থান করে। খোদাতা'লার আযাব তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

যদি বারংবার আল্লাহ্‌র রহম চাও তাহলে তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সেই সব কথা পরিহার কর যেগুলি আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করার কারণ হতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত তাকওয়া হাসিল হতে পারে না। চেষ্টা কর যেন মুত্তাকী হয়ে যাও। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে না তারা যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয় তখন তাদিগকে আর রক্ষা করা হয় না, কেবল তাদিগকে রক্ষা করা হয় যারা পূর্ব হতে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাদিগকে তাদের অবধ্যতা ধ্বংস করে, কেবল তাকওয়াই মুত্তাকীদিগকে তখন রক্ষা করে। মানুষ যদি নিজের চাতুর্য ও দুষ্টামি এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা আযাব থেকে রক্ষা পেতে চায়, তারা আদৌ রক্ষা পেতে পারে না। কোন মানুষও না নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারে না সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করতে পারে এবং না কোন সফলতাই অর্জন করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্‌র ফযল শামিল হয়। তাই আল্লাহ্‌র সঙ্গে অবশ্যই গোপন সম্পর্ক রাখা উচিত। এবং এই সম্পর্ককে সংরক্ষিত রাখা উচিত; বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে এই সম্পর্ককে সংরক্ষিত রাখে এবং যে ব্যক্তি এই সম্পর্ককে সংরক্ষিত রাখে না সে নির্বোধদের অন্তর্গত। যে ব্যক্তি নিজ চাতুর্যে আহ্লাদী সে বিনাশোন্মুখ, সে কখনো কৃতকর্ম ও সফল হবে না। লক্ষ্য কর! এই পৃথিবী ও আকাশ এবং যা কিছু এইগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে, এত বিশাল কারখানা ইহা কি খোদাতা'লার গুপ্ত হস্ত ব্যতিরেকে চলতে পারে? কখনো নয়।

স্মরণ রেখো, যে ব্যক্তি শান্তির অবস্থাতে ভয় করে তাকে ভয়ের মধ্যে রক্ষা করা হয় এবং যে ব্যক্তি ভয়ের মধ্যে ভয় করে, তার জন্য এটা কোন বৈশিষ্ট্যের বিষয় নয়; এমন সময়ে তো কাফের মুশরেক অধার্মিকও ভয়ে করে। ফেরআউনও এমন সময়ে ভয় করে বলেছিল

امنت انه لا اله الا الذى امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين

(অর্থাৎ আমি ঈমান আনলাম ইহার উপর যে, তিনি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই যার উপর বনী ইসরাঈল এনেছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্গত। (ইউনুস: ৯১ আঃ) ইহাতে তার এইটুকু উপকার হলো যে, খোদাতা'লা তাকে বললেন, আমি তোমার দেহটিকে তো রক্ষা করবো কিন্তু তোমার প্রাণকে আর রক্ষা করবো না। মোট কথা যখন পাপ ও গোনাহ্‌র মধ্যে মানুষ উন্নতি করে তখন কেবল لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (অর্থাৎ তারা এক মুহূর্তও না পিছনে যেতে পারে এবং না আগে বাড়তে পারে। (আ'রাফ: ৩৫ আয়াত) এই ব্যবহারই করা হয় তাদের সাথে। মানুষের উচিত, পূর্ব হতেই যেন সে খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে। (মলফুযাত: ৭ম খণ্ড ৩৬৯-৭০ পৃঃ)

হাকিকাতুল ওহী

মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদকঃ নাজির আহমদ ভূ'ইয়া

(১৮শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

১৪৩নং নিদর্শনঃ ইহার পরে খোদাতা'লা আমাকে আরো একটি খুশীর নিদর্শন দান করেন। তাহা এই যে, আমি এই দিনগুলিতে একবার দোয়া করিয়াছিলাম খোদাতা'লা যেন আমাকে কোন তাজা নিদর্শন দেখান। তখন আমার নিকট ইলহাম হইল যে, আজ কাল কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে, অর্থাৎ খুব শীঘ্র কোন নিদর্শন প্রকাশিত হইবে। ইহা ১৯০৬ সালের ৩০শে আগষ্টের বদর পত্রিকায় ছাপানো হয়। বস্তুতঃ ঐ নিদর্শন এইভাবে প্রকাশিত হইল যে, আমি কয়েকবার এইরূপ ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখি যাহাতে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছিল আমার শ্বশুর মীর নাসের নওয়াব এর স্ত্রীর উপর কোন বিপদ আসিবে। বস্তুতঃ একবার আমি ঘরে ছাগলের একটি রান টাঙ্গানো অবস্থায় দেখিলাম, যাহা কাহারো মৃত্যুর প্রতি ইঙ্গিত করিতেছিল। অন্য একবার আমি দেখিলাম এসিষ্টেন্ট সার্জন ডাক্তার আবদুল হাকিম খান ঐ চিলাকোঠার পাশে বাহিরের দিকে চৌকাঠের সাথে লাগিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে আমি থাকি তখন কোন ব্যক্তি আমাকে বলিল, আবদুল হাকিম খানকে ইসহাকের মাতা ঘরের ভিতরে ডাকিয়াছে (ইসহাকের মাতা মীর নাসের নওয়াব সাহেবের স্ত্রী। ইসহাক তাহার ছেলে)। তাহারা সকলে আমার গৃহে থাকে। তখন এই কথা শুনিয়া আমি উত্তর দিলাম, আবদুল হাকিম খানকে কখনো আমার গৃহে আসিতে দিব না। ইহাতে আমাদের অসম্মান হইবে। তখন সে চোখের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল; ভিতরে প্রবেশ করিল না।

স্মরণ রাখিতে হইবে, তা'বিরের পুস্তকে তা'বির বিশারদগণ লেখেন যে, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যদি কাহারো গৃহে দুশমন প্রবেশ করে তবে ঐ গৃহে কোন বিপদ বা মৃত্যু আসে। যেহেতু আজকাল আবদুল হাকিম খান আমার প্রাণের দুশমন এবং রাত দিন আমার বিনাশের অপেক্ষায় আছে, সে জন্য খোদাতা'লা স্বপ্নে তাহাকে দেখাইয়াছেন যেন সে আমার গৃহে প্রবেশ করিতে চাহিতেছে এবং ইসহাকের মাতা অর্থাৎ মীর নাসের সাহেবের স্ত্রী তাহাকে ডাকিতেছে। তা'বির এই লেখা হইয়াছে যে, এইরূপ ব্যক্তি কেবল নিজের ধর্মীয় দুর্বলতার দরুন, যাহা খোদাতা'লা জানেন, বিপদকে নিজের গৃহে ডাকে। অর্থাৎ তাহার বর্ত্তমান অবস্থা চাহিতেছে যে, তাহার উপর কোন বিপদ অবতীর্ণ হউক। বলাবাহুল্য, মানুষ পাপ

ও গুণাহ্ হইতে মুক্ত নহে। বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া মানব প্রকৃতি স্খলন হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে না এবং ঐ স্খলন চাহে যে কোন ভংসনা অবতীর্ণ হউক। ইহাতে সমগ্র বিশ্ব অংশীদার। অতএব এই স্বপ্নের এই অর্থই ছিল যে, তাহার স্খলন দুশমনকে গৃহে ডাকিতে চাহিল, কিন্তু সুপারিশ ইহাকে বাধা দিল। আমি স্বপ্নে আবদুল হাকিম খানকে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হইতে বিরত করিলাম। অর্থাৎ খোদাতা'লার যে ফযল আমার সহিত রহিয়াছে তাহা দুশমনকে কুৎসার সুযোগ হইতে বিরত রাখিল। মোট কথা, যখন ইলহামের মাধ্যমে আমি নিশ্চিতরূপে অনুধাবন করিলাম যে, মীর সাহেবের স্ত্রীর উপর কোন বিপদ আসন্ন তখন দোয়ায় লাগিয়া গেলাম। ঘটনাক্রমে নিজের পুত্র ইসহাক ও নিজ গৃহের লোকদিগকে লইয়া তাহার লাহোর যাওয়ার কথা ছিল। আমি তাহাকে এই স্বপ্ন শুনাইয়া দিলাম এবং লাহোর যাওয়া হইতে বিরত করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি আপনার অনুমতি ছাড়া কখনো যাইব না। পরের দিন ভোরে মীর সাহেবের পুত্র ইসহাকের প্রবল জ্বর দেখা দিল। সকলে খুব ঘাবড়াইয়া গেল। তাহার উভয় রানের ফাঁকে গুটি বাহির হইল এবং সকলে বিশ্বাস করিল ইহা প্লেগ। কেননা, এই জেলার কোন কোন মৌজায় প্লেগ দেখা দিয়াছে। তখন বুঝা গেল উপরোল্লিখিত স্বপ্নগুলির তা'বির ইহাই ছিল। ইহাতে আমার মনে ভয়ানক চিন্তা দেখা দিল আমি মীর সাহেবের গৃহের লোকদেরকে বলিয়া দিলাম, আমিতো দোয়া করিতেছি; আপনি (মীর সাহেবের স্ত্রী) বেশী বেশী তওবা ও ইস্তেগফার করুন। কেননা, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি আপনি দুশমনকে নিজ গৃহে ডাকিয়াছেন। ইহা কোন স্খলনের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে। যদিও আমি জানিতাম মৃত্যু আদি হইতে এক প্রাকৃতিক বিধান, তথাপি আমার মনে হইল যদি, খোদা না করুন, আমার গৃহে কেহ প্লেগে মারা যায় তবে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করিতে একটি কেয়ামত সদৃশ হৈ চৈ শুরু হইয়া যাইবে। অতঃপর আমি হাজার হাজার নিদর্শন পেশ করিলেও এই আপত্তির মোকাবেলায় ঐগুলির কোন ফলই হইবে না। কেননা, আমি শত শত বার লিখিয়াছি, প্রকাশ করিয়াছি এবং হাজার হাজার লোককে বলিয়াছি যে, আমার গৃহের সকল লোক প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবে। মোট কথা, ঐ সময় আমার হৃদয়ের যে অবস্থা ছিল তাহা বর্ণনা করা সম্ভব নহে। আমি তৎক্ষণাৎ দোয়ায় রত হইয়া গেলাম। দোয়ার পর অদ্ভুত কুদরতের দৃশ্য দেখিলাম যে, দুই তিন ঘন্টায় অস্বাভাবিকভাবে ইসহাকের জ্বর নামিয়া গেল এবং গুটির চিহ্নই রহিল না। সে উঠিয়া বসিল। শুধু তাহাই নহে। বরং সে চলিতে, ফিরিতে, খেলিতে ও দৌড়াইতে শুরু করিয়া দিল, যেন কখনো তাহার কোন অসুখই হয় নাই। ইহাই হইল মৃতকে জীবিত করা। আমি হলফ করিয়া বলতে পারি হযরত ঈসার মৃতকে জীবিত করার মধ্যে ইহার চাইতে এক বিন্দু বেশী কিছু ছিল না। এখন লোকেরা চাহিলে ইহার উপর

যে কোন মোজেযা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু সত্য ইহাই ছিল। যে ব্যক্তি সত্যিকার-ভাবে মরিয়া যায় এবং এই পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যায় এবং মালেকুল মওউত যাহার রূহ্ কবয করিয়া নেয় সে কখনো ফিরিয়া আসে না। দেখ, আল্লাহ্তা'লা কুরআন শরীফে বলেন, فيمسك التي قضى عليها الموت (সূরা আল্ যুমার—আয়াত ৪০—অর্থ: অতঃপর যাহাদের জন্য মৃত্যুর ফয়সালা করেন তাহাদের রূহ্কে ধরিয়া রাখেন—অনুবাদক)

১৪৪ নং নিদর্শন: খাস্ আলীগড়ের বাসিন্দা মৌলবী ইসমাঈল ঐ ব্যক্তি ছিল, যে সকলের পূর্বে শত্রুতায় বদ্ধপরিকর হইল। আমি আমার পুস্তক ফতেহ্ ইসলামে লিখিয়াছি যে, সে লোকদের মধ্যে আমার সম্পর্কে এই কথা প্রচার করিল এই ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যা দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া থাকে এবং তাহার নিকট জ্যোতির্বিদ্যার যন্ত্রপাতি মজুদ আছে। আমি তাহার সম্পর্কে لعنة الله على الكاذبين (অর্থ: মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভি-সম্পাত বর্ষিত হউক—অনুবাদক) বলিয়াছিলাম এবং তাহার জন্য খোদাতা'লার শাস্তি চাহিয়াছিলাম। আমি 'ফতেহ ইসলাম' পুস্তক লেখার সময় তাহার জীবদ্দশাতেই এই কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম এবং ইহা লিখিয়াছিলাম:

تعالوا ندع ابناء نا وابناء كم و نساء نا و نساء كم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين

(সূরা আলে ইমরান—আয়াত ৬২, অর্থ: আস, আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগণকে এবং তোমাদের নারীগণকে, এবং আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে, অতঃপর কান্নাকাটি করিয়া দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র লা'নত যাচ্না করি—অনুবাদক)। বস্তুতঃ এই মোবাহালার প্রায় এক বৎসর পর সে একবার কোন আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া মরিয়া গেল। সে আমার মোকাবেলায় এবং আমার বিরুদ্ধে যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে লিখিয়াছিল যে, جاء الحق و زهق الباطل (অর্থ: সত্য আসিয়াছে এবং মিথ্যা পলায়ন করিয়াছে—অনুবাদক)। অতএব খোদা লোকদের নিকট প্রকাশ করিয়া দিলেন সত্য কোন্টি, যাহা কায়েম রহিল এবং মিথ্যা কোনটি ছিল, যাহা পলায়ন করিল। প্রায় ১৬ (ষোল বৎসর) হইয়া গেল সে এই মোবাহালার পর মরিয়া গেল। *

---

* টিকা: মৌলবী ইসমাঈল তাহার এক পুস্তকে আমার মৃত্যুর জন্য বদ্দোয়া করিয়া ছিল। এই বদদোয়ার পর সে শীঘ্র মরিয়া গেল এবং তাহার বদ্দোয়া তাহার উপরই পড়িল।

১৪৫ নিদর্শন *:—মৌলবী গোলাম দস্তগীর কসুরী তাহার পুস্তক 'ফতেহ্ রহমানী' তে মোবাহালার আকারে আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিয়াছিল। এই পুস্তকটি ১৩১৫ হিজরীতে আমার বিরুদ্ধে লুধিয়ানার মাতবা (মুদ্রণালয়) আহমদী ছাপিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকের ২৬ ও ২৭ পৃষ্ঠায় তাহার এই বদদোয়া ছিল:

اللهم يا ذا الجلال والاكرام يا مالك الملك

(অর্থ:-হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী, হে রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌—অনুবাদক)। তুমি যেভাবে এক হক্কানী আলেম মহ্‌মা বেহারুল আনোয়ার এর প্রণেতা হযরত মোহাম্মদ তাহেরের দোয়ার ও সাধনায় ঐ মিথ্যা মাহদী ও জাল মসীহকে ধ্বংস করিয়াছ (যে তাহার যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল) তদ্রূপেই কসুর নিবাসী এই ফকির (কানাল্লাহু লাহূ—আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সাথী হোন)-এর দোয়ায় ও মিনতীতে, যে সরল অন্তঃকরণে তোমার শক্তিশালী ধর্মের সাহায্যে যথাসাধ্য সচেষ্ট, তুমি মিথ্যা কাদিয়ানী ও তাহার হাওয়ারীদিগকে যথার্থ তওবার তওফীক দান কর। যদি ইহা তাহাদের তকদীরে না থাকে তবে তাহাদের জন্য এই কোরআনী আয়াত প্রযোজ্য কর—

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين - انك على كل شيء قدير - و بالاجابة جدير - آمين

অর্থাৎ যে সকল লোক যালেম তাহারা শিকড়সহ কাটা যাইবে। খোদার জন্য প্রশংসা। তুমি সব কিছুর উপর শক্তিশালী এবং তুমি দোয়া কবুলকারী। অতঃপর উপরোক্ত পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত মৌলবী আমার সম্পর্কে লেখে-তبا له و لا تباعه

অর্থাৎ সে ও তাহার অনুসারীরা ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব খোদাতা'লার ফযলে আমি এখনো জীবিত আছি এবং আমার অনুসারীদের সংখ্যা ঐ যুগের তুলনায় এখন শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগের বেশী। বলা বাহুল্য মৌলবী গোলাম দস্তগীর আমার সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী হওয়ার ফয়সালা فقطع دابر القوم الذين ظلموا আয়াতের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল। এস্থলে ইহার অর্থ এই যে, যে যালেম হইবে তাহার শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইবে। এই বিষয়টি কোন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট গোপন নহে যে, উল্লেখিত আয়াতের বিষয়-বস্তু সকলের জানা আছে। ঐ ব্যক্তির উপর উহার ক্রিয়া হয়, যে যালেম। অতএব ইহা নিশ্চিত ছিল যে, যালেম উহার ক্রিয়ায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং গোলাম দস্তগীর যেহেতু খোদাতা'লার দৃষ্টিতে যালেম ছিল, সেজন্য নিজের এই পুস্তকের প্রচার দেখিয়া যাওয়ারও সময় সে পাইল না; তৎপূর্বেই সে মরিয়া গেল। সকলে জানে এই দোয়ার কয়েক দিন পরেই তাহার মৃত্যু হইল।

* টীকা:—বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য পুনরায় লেখা হইল।

কোন কোন অজ্ঞ মৌলবী লেখে যে, গোলাম দস্তগীর মোবাহালা করে নাই, কেবল যালেমের বিরুদ্ধে বদদোয়া করিয়াছিল। কিন্তু আমি বলি, যেস্থলে সে আমার মৃত্যুর ব্যাপারে খোদার নিকট ফয়সালা* চাহিয়াছিল এবং আমাকে যালেম আখ্যায়িত করিয়াছিল, সেস্থলে ঐ বদদোয়া তাহার উপর কেন পড়িয়া গেল এবং খোদা এইরূপ নাজুক সময়ে যখন লোকেরা খোদায়ী ফয়সালার অপেক্ষায় ছিল তখন গোলাম দস্তগীরকেই কেন ধ্বংস করিয়া দিলেন এবং যখন সে তাহার দোয়ায় আমার বিনাশপ্রাপ্তি চাহিতেছিল যাহাতে জগদ্বাসীর নিকট ইহা প্রমাণিত হইয়া যায় যে, যেভাবে মোহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় মিথ্যা মাহদী ও মিথ্যা মসীহ্ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল যেভাবে আমার বদদোয়ায় এই ব্যক্তি বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তখন এই দোয়ার কেন উল্টা ফল ফলিল? ইহাতো সত্য যে, মোহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় মিথ্যা মাহদী ও মিথ্যা মসীহ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ মোহাম্মদ তাহেরেরই অনুকরণে গোলাম দস্তগীর আমার বিরুদ্ধে বদদোয়া করিয়াছিল। এমতাবস্থায় ভাবিয়া দেখা উচিত মোহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় কী ফল হইল এবং গোলাম দস্তগীরের দোয়ার কী ফল হইল। যদি বল গোলাম দস্তগীর ঘটনাক্রমে মরিয়া গেল, তবে এই কথাও বল যে, ঐ মিথ্যা মাহদীও ঘটনাক্রমে মরিয়া গিয়াছিল এবং ইহাতে মোহাম্মদ তাহেরের কোন কেরামতি ছিল না। لعنة الله على الكاذبين (অর্থ :—মিথ্যবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত বর্ষিত হউক—অনুবাদক)।

এখন গোলাম দস্তগীরের মৃত্যুর প্রায় এগার বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। যে যালেম ছিল খোদা তাহাকে ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহার গৃহ বিরাণ করিয়া দিয়াছেন। এখন বিচার করিয়া বল কাহার শিকড় কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং কাহার উপর এই বদদোয়া কার্যকরী হইল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يقطع دابر القوم الذين ظلموا (সূরা আত্ তাওবা—আয়াত ৯৮) অর্থাৎ হে নবী! এই মন্দ স্বভাবের দুশমনেরা তোমার জন্য নানা ধরনের বিপদ কামনা করে। তাহাদের উপরই বিপদ আপতিত হইবে। অতএব এই আয়াতে করীমা অনুযায়ী ইহা আল্লাহ্র বিধান যে, যে ব্যক্তি সত্যবাদীর উপর কোন

---

* টীকা :—গোলাম দস্তগীর আমার সম্পর্কে এই আকাঙ্খা করিয়াছিল তাহার বদদোয়ায় আমি যেন মরিয়া যাই এবং ইহাতে যেন এই কথা প্রমাণিত হয় আমি মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা বানাইয়া বলি এবং মোহাম্মদ তাহেরের ন্যায় গোলাম দস্তগীরের কেরামতি প্রমাণিত হয়। অন্যদিকে আমার খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলেন,

انى مهين من اراد اهانتك

অর্থাৎ যে তোমার অবমাননা চাহে আমি তাহাকে লাঞ্ছিত করিব। অবশেষে খোদার ফয়সালায় গোলাম দস্তগীর ধ্বংস হইয়া গেল এবং আমি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখনো জীবিত আছি। ইহা একটি মহান নিদর্শন।

বদদোয়া করে ঐ বদদোয়াই তাহার উপর পড়ে। আল্লাহ্‌র এই বিধান কোরআন ও হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয়। অতএব এখন বল, গোলাম দস্তগীর এই বদদোয়ার পর মরিয়া গিয়াছে, না কী মরে নাই। অতএব বল ইহার মধ্যে কী রহস্য আছে যে, মোহাম্মদ তাহেরের বদদোয়ায় এক মিথ্যা মসীহ মরিয়া গেল এবং আমার উপর বদদোয়াকারী নিজেই মরিয়া গেল। খোদা আমার আয়ু বাড়াইয়া দিলেন। ১১ (এগার) বৎসর হইতে এখন পর্যন্ত আমি জীবিত আছি এইং গোলাম দস্তগীরকে এক মাসেরও অবকাশ দেওয়া হইল না।

১৪৬ নং নিদর্শন ঃ—নবাব মোহাম্মদ হায়াত খান জুডিসিয়াল জজ ছিলেন। তিনি কোন ফৌজদারী অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহার মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হইতেছিল না। তখন তিনি আমার নিকট দোয়ার দরখাস্ত করেন এবং আমি দোয়া করিলাম। তখন খোদা আমার নিকট প্রকাশ করেন যে, তিনি মুক্ত হইয়া যাইবেন। এই খবর তাহাকে এবং আরো অনেক লোককে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই শুনাইয়া দেওয়া হইল। ইহা বারাহীনে আহমদীয়ায় সবিস্তারে লিপিবদ্ধ আছে। অবশেষে তিনি খোদাতা'লার ফযলে মুক্ত হইয়া গেলেন।

১৪৭ নং নিদর্শন ঃ—একবার ১৯০৫ সালের মার্চ মাসে অভাবের সময় লংগরখানার খরচের জন্য আয়ে খুবই টানাটানি দেখা দিল। কেননা, মেহমানদের আগমন ছিল বিপুল সংখ্যায়। কিন্তু ইহার তুলনায় অর্থ সমাগম ছিল কম। এই জন্য দোয়া করা হইল। ১৯০৫ সালের মার্চে আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক ব্যক্তি, যাহাকে ফেরেশ্‌তা মনে হইতেছিল, সে আমার সম্মুখে আসিল এবং সে আমার অঞ্চলে অনেক টাকা ঢালিয়া দিল। আমি তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কহিল, কোন নাম নাই। আমি বলিলাম, নামতো একটা কিছু হইবে। সে বলিল, আমার নাম 'টিচি, টিচি'। পাঞ্জাবী ভাষায় ইহার অর্থ নির্ধারিত সময়, অর্থাৎ ঠিক প্রয়োজনের সময় আগমনকারী। তখন আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। ইহার পর খোদাতা'লার পক্ষ ইহাতে কি ডাকযোগে না কি সরাসরি লোকদের হাত দ্বারা এত আর্থিক স্বচ্ছলতা হইল, যাহার সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। কয়েক হাজার টাকা আসিয়া গেল। বস্তুতঃ যে কোন লোক ইহার সত্যায়নের জন্য যদি ১৯০৫ সালের ৫ই মার্চ হইতে বৎসরের শেষ নাগাদ পর্যন্ত কেবল পোষ্ট অফিসের রেজিষ্টারই দেখে তবে সে জানিতে পারিবে কত টাকা আসিয়াছিল।

স্মরণ রাখিতে হইবে আমার সহিত খোদাতা'লার আচরণ এইরূপ যে, প্রায়শঃ নগদ টাকা আসার সময় হইলে বা উপঢৌকনরূপে দ্রব্য-সামগ্রী আসার সময় হইলে উহার খবর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তিনি ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে আমাকে দিয়া থাকেন এই ধরনের নিদর্শন পঞ্চাশ হাজারের কিছু বেশী হইবে। (ক্রমশঃ)

জুমু'আর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)

(২২শে ডিসেম্বর, ১৯৯৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত)

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
সদর মুরব্বী

ইসলামের প্রধান্য বিস্তার বলতে বুঝায় হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূরের প্রাধান্য, যা অপরাপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধারিত।

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল-সাফ্-এর অষ্টম ও দশম আয়াত তেলাওয়াত করেন :

ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام - والله لا يهدى القوم الظلمين ٥

يريدون ليطفؤا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكفرون ٥

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ٥ (الصف : ٨-١٠)

(সরল অনুবাদ ঃ এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম কে, যে আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, অথচ তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়, বস্তুতঃ আল্লাহ্ কখনও যালেম জাতিকে হেদায়াত দেন না।

তাহারা চাহে যেন তাহারা নিজেদের মুখের ফুৎকার দ্বারা আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করে, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁহার নিজ নূরকে নিশ্চয় পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবেন, কাফেরগণ যত অসন্তুষ্ট হউক না কেন।

তিনিই তাঁহার রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করিয়া দেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্ট হউক না কেন)।

অতঃপর হুযূর বলেন :

এ আয়াতগুলোর প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপনের পূর্বে কয়েকটি ঘোষণা রয়েছে। এক, জামাত আহমদীয়া নাইজেরিয়ার তিন দিন স্থায়ী সালানা জলসা আজ ২২শে ডিসেম্বর হতে আরম্ভ হতে যাচ্ছে। দুই, জামাত আহমদীয়া, ওয়েষ্ট কোস্ট ইউ-এস-এর সালানা

জলসা আজ ২২শে ডিসেম্বর লসএঞ্জেলসে অনুষ্ঠিত হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আমীর মুকাররম এম, এম, আহমদ সাহেবও খোদাতা'লার ফযলে উহাতে যোগদানের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছেন। এ কথাটি বলার এ জন্যে আবশ্যক ছিল যে, তাঁর স্বাস্থ্য বিগত কিছু কাল থেকে যথেষ্ট খারাপ ছিল এবং আমি দোয়ার জন্যে তাহ্‌রীকও করতে থাকি। ফলে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর অপার অনুগ্রহে তাকে আরোগ্য দান করেছেন এবং এতটুকু শক্তি দিয়েছেন যে, তিনি ওয়াশিংটন থেকে লস এঞ্জেল্‌সের সফর করতে পেরেছেন। এখন তিনি নিজে সেখানে উক্ত জলসায় অংশগ্রহণ করছেন। তিন, হল্যাণ্ড জামা'তের বার্ষিক তরবীয়তী ইজতেমা আজ হতে আরম্ভ হচ্ছে, ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। চার, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, ইণ্ডোনেশিয়ার সালানা ইজতেমা ও মজলিসে-শূরা আজ থেকে শুরু হতে যাচ্ছে—প্রথম দু'দিন ইজতেমা এবং তৃতীয় দিনে শূরা অনুষ্ঠিত হবে। পাঁচ, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ নরওয়ের মজলিসে শূরা ২৪ ডিসেম্বর রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। এ সব দেশের আমীর সাহেবান আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন, যেন তাদের পক্ষ থেকে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত সকল জামা'তকে 'আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু'-এর তোহ্‌ফা পৌঁছান হয় এবং তাদের এই সভা-সম্মেলনগুলোকে নিজেদের দোয়ায় স্মরণ রাখার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। আল্লাহ্‌তা'লা এই সমস্ত অনুষ্ঠানকেই সব দিক দিয়ে বরকতমণ্ডিত করে তুলুন এবং যে-সব বরকত যোগদানকারীদের লাভ করার সৌভাগ্য ঘটে সেগুলো (তাদের জীবনে) স্থিতিশীল হোক। মাত্র কয়েক দিন অবস্থান করার পর সঙ্গত্যাগকারী না হোক।

সর্বশেষ দরখাস্তটি যা জার্মানী জামা'তের আমীর সাহেবের পক্ষ থেকে এসেছে, তা হচ্ছে এই যে, জুমুআর খোৎবাতে তবলীগের প্রতি পুনরায় জামা'তের বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে পূর্বে প্রদত্ত এক খোৎবার সুপ্রভাব প্রকাশ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং ইহা (তবলীগ) এরূপ এক বিষয়-বস্তু যার তীব্র আবশ্যকতা অনুভূত হয়। জার্মানীর আমীর সাহেব তাঁর কয়েকজন সাথীদের নিয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে তবলীগের দায়িত্ব সম্পাদনে তৎপর হয়েছেন। এমন কি প্রত্যেকটি জামা'তে অথবা কয়েকটি জামা'ত সমন্বয়ে গঠিত সবগুলো কেন্দ্রে পৌঁছুচ্ছেন এবং নিজে অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করে তাদের তবলীগি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ণ করছেন। নতুন নতুন পরামর্শ দিচ্ছেন। এই ধারায় জার্মানী জামা'তে তবলীগের বিরাট এক অভিযান শুরু হয়েছে। তাতে জামা'তের বিপুল সংখ্যক আহ্‌মদী অংশগ্রহণ করছেন। সে প্রসঙ্গে তিনি বলছিলেন—চিঠিও লিখেছেন এবং ফোন যোগেও এই বলে আবেদন জানিয়েছেন, "আমি আবশ্যক মনে করি, আপনি সরাসরি যদি কিছু বলে দেন, তাহলে উহা আমাদের এই অভিযানের স্বপক্ষে সাড়া জাগানো বাতাসস্বরূপ হবে।

ইহা বাস্তব সত্য যে, আল্লাহ্‌তা'লা যখনই জামাত আহমদীয়ার কোনও খলীফাকে কোন 'তাহ্‌রীক' বা আহ্বান করার তওফীক দান করেন, তখন যেরূপ অসাধারণভাবে "লাব্বাইক, লাব্বাইক' ধ্বনি উত্থিত হয় এবং জামাত দ্রুত বেগে ঈপ্সিত অভিমুখে ধাবিত হয়ে পড়ে, সেরূপ প্রভাব অন্যান্য আহ্বানে পরিলক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ উক্ত বিষয়টিও আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আহমদীয়া খিলাফতের আবশ্যকতার স্বপক্ষে এক নিদর্শন ও দলিল স্বরূপ, যার কোন জবাব নেই—না যুক্তিতে, না অভিজ্ঞতায় ও দৃষ্টান্তে। সারা দুনিয়া ব্যাপী (অন্য) কোন আওয়াজকে খোদাতা'লা এ শক্তি-সামর্থ্য দেন নি যে, সে আওয়াজ উত্থিত হলে গোটা বিশ্বের প্রান্ত প্রান্ত থেকে কেবল যে মৌখিক সমর্থন ও আনুগত্যের বহিঃ প্রকাশ ঘটে তাই নয়, বরং আদমকে সিজদা করার ন্যায় সবাই মন, প্রাণ ও দেহের সমস্ত কিছু সে আওয়াজের সমর্থন ও আনুগত্যে পেশ করে দেয়। অর্থাৎ শির্‌ক বিবর্জিত যে সিজদাই আদমের জন্যে জায়েয, সে সিজদা (আনুগত্য) খিলাফতের সাথে সম্পর্ক রাখে; এ অর্থেই আমি এ দৃষ্টান্তটি দিয়েছি। বস্তুতঃ খিলাফতে-আহমদীয়া-হাক্কার স্বপক্ষে অপরিহার্য ছিল যে, খোদাতা'লা মানবিক মন-মেযাজে সিজদার সেই প্রবণতা সৃষ্টি করতেন, যা করা হয়েছিল আদমের স্বপক্ষে এ অর্থে যে, তিনি যেহেতু খোদাতা'লার আওয়াজকে অনুসরণ করছেন, সেহেতু তার আনুগত্য কর। অতএব, এই আমাদের অভিজ্ঞতা এতো ব্যাপক যে, বিগত ঐ খোৎবার ক্ষেত্রে আমার স্মরণ আছে যে, সে খোৎবার মাধ্যমে যখন আমি কেনাডার জামাতকে জাগাবার চেষ্টা করেছিলাম, তাদেরকে নাড়া দিয়েছিলাম, তখন ছোট, বড়, নারী, পুরুষ সকলের পক্ষ থেকে এতো বিপুল সংখ্যায় চিঠি-পত্র আসে, যা দেখে আমি হতবাক হয়ে পড়ি। তারা বলেন, "আমাদের ভুল হয়ে গেছে; বিগত ত্রুটি ও গাফলতি আমাদের ক্ষমা করে দিন।" এখন তো সমগ্র জামাতের মাঝে এক প্রকার শিহরণ ছড়িয়ে গেছে। ছোট-বড় সবাই তবলীগের পথ খুঁজছেন এবং অনেকেই তবলীগে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছেন। অতএব, এদিক থেকে জার্মানীর আমীর আবদুল্লাহ ওয়াগস হাওজার সাহেবের পরামর্শ ষোলআনা সঠিক। কিন্তু এটাকে চমৎকার এক কাকতালীয় ব্যাপারই বলুন বা ঐশী নিয়ন্ত্রণ যে, যে-আয়াতসমূহ আমি তেলাওয়াত করেছি, এগুলো পূর্ব থেকেই নির্বাচিত ও চিহ্নিত ছিল এবং এগুলোর পালা এখানেই ছিল যেখানে আছে। অর্থাৎ নূর সম্পর্কে খোৎবার যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তাতে ক্রমধারায় যে-সব আয়াত আমি সাজিয়ে রেখেছি। সেখানে এ আয়াতই আমার সামনে ছিল। বস্তুতঃ এ আয়াতটিতে তবলীগের উল্লেখ রয়েছে এবং এর সূত্র ধরে—জার্মানীর আমীর সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন বা না-ই করতেন, অনিবার্যতঃ আমি নিজেই এ বিষয়টির উল্লেখ করতাম। অতএব, এ দিক থেকে আমি এখন উক্ত আয়াতসমূহের দিকে ফিরে যাচ্ছি এবং এর বিষয়-বস্তু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করছি।

প্রথম আয়াতটি এ বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যে, এরূপ কোন ব্যক্তি, যাকে ইসলামের

দিকে আহ্বান করা হচ্ছে এবং সে খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপও করছে, সে কখনও সফলকাম হতে পারে না ; অনিবার্যতঃ সে হচ্ছে যালেম। অতএব, যদি ওরূপ ব্যক্তি খোদার দিকে আহ্বান করে এবং বলে, "খোদা আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং আমার সাথে কালাম করেন" অথচ মানুষ তাকে বলে, "মুসলমান হয়ে যাও, মুসলমান হয়ে যাও, তুমি মুসলমান নও।" তথাপি সে তার দাবীতে অটল থাকে। সে যদি সফলকাম হয় তাহলে অনিবার্যতঃ সে সত্যবাদী। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লা যালেমদের সাহায্য করেন না। যালেমদেরকে কখনও সফলতায় ভূষিত করা হয় না। এই দলিল বা যুক্তি কায়েম করার পর বলেছেন যে, ওরূপ তো অবশ্যই হবে। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা খোদাতা'লার প্রজ্বলিত প্রদীপকে নির্বাপিত করে দিতে সচেষ্ট হবে। অতএব "ওয়া মান আযলামু....." আয়াতটিতে বিষয়-বস্তু এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খোদা-প্রেরিত যে ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ লাগানো হয়, তাকে প্রতারক, খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী, ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত—যা ইচ্ছা তোমরা বল না কেন, যদি তোমাদের কথা সঠিক হয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি হচ্ছে সব চেয়ে যালেম। তার ব্যাপার নিষ্পত্তির (এবং তার শাস্তি বিধানের) জন্যে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে তোমাদের কথা যদি সঠিক না হয়, তাহলে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ তোমাদের মুখের ফুৎকার বই অন্য কিছুই নয় এবং খোদা প্রজ্বলিত প্রদীপকে মুখের ফুৎকারের দ্বারা কখনও নেবানো যায় না। যা-ইচ্ছা কর। যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তোমরা কখনও সে আওয়াজকে ব্যর্থ করতে পারবে না, যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছে, যদিও তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী মনে কর না কেন।

এই হচ্ছে আয়াতদ্বয়ের বিষয়-বস্তু। "ইউরিদূনা লি-ইউতফেউ নূরাল্লাহে বি-আফ্‌-ওয়াহিহিম"—তারা চায়, আল্লাহ্‌র নূরকে তাদের মুখের ফুৎকারের দ্বারা নিবিয়ে দিতে, "ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি"—কিন্তু আল্লাহ্‌ নিশ্চয় তাঁর নূরকে 'তামাম' (পরিপূর্ণ) করে ছাড়বেন ; "ওয়া লাও কারেহাল কাফেরুন"—অস্বীকারকারীরা যতই অপসন্দ করুকনা কেন। তাদের এই অপসন্দ তাদের কোন কাজে আসবে না। এখানে নূরের অর্থ হচ্ছে, এরদ্বারা দীন-ইসলাম বুঝায়। অতএব, এ দিক থেকেই আমি আয়াতটিকে ক্রমধারায় রেখেছিলাম যে, ইসলাম কোন আয়াতের দ্বারা নূর প্রমাণিত হয় এবং কী অর্থে প্রমাণিত হয়, তারপর এর ফলশ্রুতিতে এই নূরকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের উপরে যে দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় উহা কী এবং এ প্রসঙ্গে আমাদেরকে কী সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুসংবাদ হচ্ছে এই যে :—

"হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল-হুদা ওয়া দীনেলহাক্কে লি-ইউযহেরাহু আলদ্দীনে কুল্লেহি"—মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌তা'লাই হেদায়াত এবং সত্যদীন সহকারে এউদ্দেশ্যে

প্রেরণ করেছেন যে, তিনি যেন অপরাপর সকল দীন ও মতবাদের উপরে তাকে প্রাধান্য দান করেন। "ওয়া লাও কারেহাল মুশরেকুন"—মুশরেকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন। অতএব, আহমদীয়া জামা'তের সময়কালে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও বাস্তবায়ন অবধারিত ছিল। কেননা, সূরা আল্-সাফের এ আয়াতসমূহ হযরত মসীহ্ (বর্ণিত) ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পর্ক-রাখে এবং সে প্রসঙ্গেই এর বিষয়-বস্তুকে ধারাবাহিকভাবে খোলাসা করে ব্যক্ত করা হচ্ছে। যেমন কিনা মসীহ (আঃ) বলেছিলেন যে, একজন আগমনকারী 'আহ্‌মদ' আবির্ভূত হবেন (৭ম আয়াত)। তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। কিন্তু দ্বিতীয় বার তাঁর এক জ্যোতির্বিকাশ অবধারিত ছিল অর্থাৎ এই আহমদের (সাঃ) আনুগত্যে তাঁরই কাছে রঙ ধারণ করে আহমদীয়াতের এক মসীলের বা সদৃশের আবির্ভাব অবধারিত ছিল। তাকে মানুষে মিথ্যাবাদী বলবে বলেই তাদের ঐ অপবাদের বিরুদ্ধে এই দলিল বা যুক্তি কায়েম করা হয়েছে যে, তিনি যদি খোদার বিরুদ্ধে মিথ্যারোপকারী হন তাহলে খোদা-তা'লা তাকে উন্নতি ও সফলতা কী করে দিতে পারেন?! তদুপরি যখন কিনা তার বিরুদ্ধে তারা এই অপবাদও দিয়ে থাকবে যে, তার বিরুদ্ধে হুজ্জত পূর্ণ করে তারা তাকে ইসলামের দিকে আহ্বানও করেছে, তাকে মুসলমান হবার জন্য ডেকেছে। অতএব, উক্ত আগমনকারী স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও হতে পারেন না (বরং আগমনকারী আহমদ হচ্ছেন তাঁর (সাঃ) মসীল তথা ইমাম মাহদী)। উক্ত আয়াতই হচ্ছে এর অকাট্য প্রমাণ। কেননা, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে তো কখনও কেউ ইসলামের দিকে আহ্বান করেনি, (তিনি ছিলেন বরং ইসলামের আহ্বায়ক)। অতএব, এখানে অনিবার্যতঃ রয়েছে আহমদের ঐ শান বা মর্যাদায় দ্বিতীয় বিকাশস্থলেরই উল্লেখ, যিনি দুনিয়ার শেষ জামানায় প্রকাশিত হবেন বলে নির্ধারিত ছিল। যিনি আল্লাহ্‌র আদেশে দণ্ডায়মান হবার দাবীদার হবেন। তাঁর সম্পর্কেই নির্ধারিত ছিল যে, মানুষে তাঁকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও ইসলামের গণ্ডী বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করে তাকে ইসলামে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাবে, অথচ আল্লাহ্, যাকে মনোনীত করেন, তিনিই তো হয়ে থাকেন ইসলামের হিফাযতকারী, ইসলামের পতাকাবাহী এবং শ্রেষ্ঠ খেদমতকারী। অতএব, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী উহার বিশদ বিবরণ সহ সুস্পষ্টরূপে, মহাসমারোহে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের পর আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের আকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত ও বাস্তবায়িত হয়েছে।

আজও যখনই মৌলবাদীদের 'বাসী ঝোলে বলক উঠে' (অন্য কথায় বাংলা ভাষায় বলা যায়, মরা গাঙে বান ডাকে), তখন তারা পত্র-পত্রিকায় এই মর্মে 'খোলা চিঠি' প্রকাশ করে থাকে,—"আমরা মির্যা তাহের আহ্‌মদকে ইসলামের দিকে আহ্বান

জানাচ্ছি।" তোমাদের পিতৃপুরুষরাও হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহ্দী আলাইহিস সালামের সাথে যা করেছিল তা-ও এটাই তো ছিল। আর এটাই তো সেই ভবিষ্যদ্বাণী, যা কুরআন করীমে সংরক্ষিত ছিল এবং আজও অবিকল ওরূপেই পূর্ণ হচ্ছে, যেরূপে একশ' বছর পূর্বে বাস্তবায়িত হয়েছে। তোমরা যাকে ইসলামের দিকে ডেকে আসছ, তিনিই তো ভূ-পৃষ্ঠে ইসলামের প্রতিনিধি। তাঁরই ছায়াতলে এসো। তবেই তোমরা 'ইসলামী' বলে আখ্যায়িত হবে। নইলে, ইসলামের সাথে তোমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। এ বিষয়টি অনুধাবন কর। যদি না কর, তাহলে তাতে তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি। কিন্তু তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর এবং যত পার চেষ্টা কর না কেন, আল্লাহ্ তা'লার এটাই অটল ফয়সালা, যা অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ হবে। তোমাদের কোনও চেষ্টা-তদ্বির উক্ত ইলাহী তক্দীরকে টলাতে পারে না। এবং কখনও এর পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম ঘটাতে পারবে না। "ইউরিদূনা লি-ইউত্ফিউ নূরাল্লাহে বিআফ্ওয়াহেহিম"—এই অজ্ঞ-নির্বোধেরা মনে করে যে, তারা তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে নিবিয়ে দিবে আল্লাহ্র সেই প্রদীপকে, যা তিনি নিজে প্রজ্বলিত করেছেন। "ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি"—এ তো আল্লাহ্র তকদীরের (অটল) ফয়সালা যে, তাঁর নূরকে তিনি অবশ্য অবশ্যই পরিপূর্ণ করে ছাড়বেন। "ওয়া লাও কারিহাল কাফেরূন"—অস্বীকার কারীরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

এক্ষণে 'ইতমামে-নূর' (—নূরকে পরিপূর্ণ করার) দ্বারা কী বুঝায়? এখান থেকেই আলোচনা অগ্রসর হওয়া উচিত। সবচে' প্রথম কথা হচ্ছে যে, ঐ নূর, যা ইসলামের নূর—যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আকারে এবং কুরআন করীমের আকারে অবতীর্ণ হলো এবং এতদুভয় একই সত্তার দুটি নাম হয়ে গেল, সেই নূর তো আপন গুণাবলীর দিক দিয়ে 'তামাম'—পূর্ণতা প্রাপ্তই ছিল। তারপর আবার 'ইতমামে নূর' বলার কী অর্থ? তা হচ্ছে সেই আরেক অর্থ, যা খোদাতা'লা নিজে পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার করে খুলে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই নূর তো পরিপূর্ণই বটে, কিন্তু এর 'তামাম' হবার আরও অর্থ আছে। এর 'তামাম' হবার অর্থ ইহাও যে, দুনিয়ার অপরাপর প্রত্যেক দীন—ধর্ম ও মতবাদের উপরে ইহা বিজয়ী হবে, প্রাধান্য লাভ করবে এবং সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে নিজের আওতায় বেষ্টিত করে ফেলবে, যাতে এমন কোন জায়গা অবশিষ্ট না থাকে যেখানে ইহা দীপ্তিমান না হয়। সুতরাং এই অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ্ বলেছেন: "হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল-হুদা ওয়া দীনেল হাক্কে লে-ইউযহেরাহু আলাদ্দিনে কুল্লেহী ওয়া লাও কারেহাল মুশরেকূন"—তিনি সেই আল্লাহ্ যিনি আপন এই রসূলকে হেদায়াত এবং সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা কী আকারে নির্ধারিত ছিল? সুস্পষ্ট ও অকাট্যরূপে ইহাই সঠিক

সত্য যে, এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর নূরের প্রাধান্য বিস্তার, যা অপরাপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে সাধিত হবে। কিন্তু আজ চৌদ্দ শ' বছর হতে চলেছে, এখনও মানবজাতির ঐ হতভাগ্য অংশ, যারা ইসলাম এবং এই নূরকে (সাঃ) অস্বীকার করছে তারা সংখ্যার দিক দিয়ে অনেক বেশী। মুসলমানরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগের অধিক নয়, এবং অপরাপর সব ধর্মের উপরে ইসলামের প্রাধান্য এখনও সাধিত হতে পারে নি। কাজেই কাদের হাতে কী রূপে তা সাধিত হওয়া নির্ধারিত ছিল—এ সম্পর্কে বিগত কালের বুযুর্গানদের মধ্যে থেকে (যাদেরকে 'বুযুর্গানে সালফ' বলা হয় তাদের) কয়েক জনের উদ্ধৃতি আপনাদের কাছে আমি উপস্থাপন করছি, যাতে উক্ত বিষয়টিকে এরূপ বুযুর্গদের ব্যক্ত অভিমত ও উক্তির দ্বারা খোলাসা করে তুলে ধরি, যাদের বিরুদ্ধাচরণের সাধ্য বা সাহস কোনও মোল্লা বা আলেমেরই নেই, এবং যাদের বুযর্গী ও অথরিটি সবার কাছে স্বীকৃত সত্য।

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) সমগ্র ভারতবর্ষে যাঁর অগাধ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে এবং তাঁকে একজন মহান মনীষী (বুযুর্গ) এবং আপন সময়কালের মুজাদ্দিদ হিসেবে বিরাট সংখ্যক মান্যকারী পাকিস্তান ও ভারত তথা সমগ্র উপমহাদেশে মজুদ রয়েছেন, তিনি বলেছেন: (ফার্সী ভাষায় প্রণীত তাঁর পুস্তক মানসাবে ইমামত, পৃঃ ৭০, আইনা আদাব, চক মিনার, আনারকলি, লাহোর কর্তৃক ১৯৬৭ইং সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত)—

"ওয়া যাহের আস্ত কেহ ইব্‌তিদায়ে যহরে দীন দর যামানে পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম ব-ওকু' আমদাহ্‌ ওয়া ইতমামে আঁ আয দাস্তে হযরত মাহ্‌দী ওয়াকে' শাহাদ গারদেদ।"

অর্থাৎ—"হযরত রসুল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হতেই যে দীন-ইসলামের উৎপত্তির সূচনা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু এর 'ইতমাম' মাহ্‌দীর হাতে সংঘটিত হবে।" এখানে যে ইতমাম বা পরিপূর্ণতার সুসংবাদ রয়েছে তা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সময়কালের সাথে সংযুক্ত এবং মাহ্‌দীর যামানাতেই এই 'ইতমাম' সম্পর্কিত অংশ আপন শান ও মর্যাদায় মহাসমারোহে পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) লিখেছেন ('তাফসীর রাযী' ১৬তম খণ্ড, সূরা তৌবা, পৃঃ ৪০, উক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে, 'আল-ওয়াজহুস সানী' শিরোনামের অধীনে): তিনি এখানে এই হাদীস উদ্ধৃত করেন যে, হযরত আবু হুরায়রাহ্‌ (রাঃ) বর্ণনা করেন: "উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অপরাপর সমস্ত দীনের

উপরে ইসলামকে বিজয় ও প্রাধান্য দান করবেন—এই ওয়াদার পূর্ণতা সাধিত হবে 'প্রতিশ্রুত মসীহ্'র সময়ে এবং ইমাম সিদি বলেন যে, উক্ত ওয়াদা পূর্ণ হবে প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর যামানায়।"

অতএব, শত শত বছর পূর্বে যারা শীর্ষস্থানীয় তফসীরকারক ছিলেন অথবা অন্যান্য বুযুর্গান তাঁরা উক্ত আয়াতের অনিবার্য যৌক্তিক অর্থ ইহাই বুঝেছেন যে, এই অবশ্যম্ভাবী ওয়াদা প্রতিশ্রুত মসীহ্ বা প্রতিশ্রুত মাহ্দীর যামানায় পূর্ণ হবে।

পুনরায়, 'তফসীর রূহুল মায়ানী'তে লিখিত আছে: "ওয়া যাকা ইন্দা নযুলে ঈসা আলাইহিস সালাম" (১০ম খণ্ড, সূরা তৌবার উক্ত আয়াতের প্রসঙ্গে পৃঃ ৭১)। অর্থাৎ অধিকাংশ তফসীরকারক এ মতই পোষণ করেছেন যে, উক্ত ওয়াদা মসীহ্ মাওউদ-এর যুগে পূর্ণ হবে। (ইন্দা নযুলে ঈসা আলাইহিস সালাম"—শব্দগুলোর তরজমা অনুবাদক 'মসীহ মাওউদ' লিখেছেন, যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আহমদী এই তরজমা করেছেন এবং তাদের মতে ঈসা এবং মসীহ্ যেহেতু একই ব্যক্তির দুটি নাম এবং 'মসীহ মাওউদ' পরিভাষাস্বরূপ প্রচলিত হয়ে পড়েছে, সেহেতু তিনি 'মসীহ মাওউদ' তরজমা করেছেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় তরজমার এ পদ্ধতি সঠিক নয়। তরজমা হুবহু তাই করুন যা মূলগ্রন্থে আছে এবং ব্যাখ্যায় বলুন যে, পূর্বেকার মসীহ যেহেতু ওফাত প্রাপ্ত হয়েছেন (—স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছেন) এবং (আখেরী যুগে আগমনকারী) প্রতিশ্রুত মসীহ তাঁর স্বভাব-চরিত্রে (ও গুণ ও মানে সদৃশ্য হয়ে) আসবেন, সেহেতু আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সঠিক অবস্থানে আছি যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মসীহ মাওউদ সম্পর্কিত। অতএব, ভবিষ্যতে যখনই এই তরজমা পেশ করতে হয় তখন সংশোধনী দেখে নিবেন বা করে নিবেন। কেননা, ইহা আমার হাতের তরজমা নয়। বরং ইহা পূর্বকৃত তরজমা, যাথেকে আমাদের প্রাইভেট সেক্রেটারী সাহেব উহা তুলে নিয়েছেন।)

অতএব, তরজমা এখন এই সাব্যস্ত হয় যে, অধিকাংশ তফসীরকারক এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের ঘটনা ঈসা আলাইহিস সাল্লামের নযুলের সময় সংঘটিত হবে। এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালামকে তারা ঈসা স্বরূপ মানুন বা না মানুন, তবে এটা নিশ্চিত মানতেই হবে যে, উক্ত ওয়াদাটি হচ্ছে আগমনকারী মসীহ্র সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর আমরা যেহেতু জানি এবং মানি যে, (প্রতিশ্রুত) আগমনকারী মসীহ এসে গেছেন, সেহেতু আমাদের উপরে তো সনদ ও হুজ্জত পূর্ণ হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক আহ্মদীর কর্তব্য হচ্ছে, এসব ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস সালামের মাধ্যমে পূর্ণ হতে স্বীকার করে নিয়ে এর ফলশ্রুতিতে তার উপরে অর্পিত দায়িত্বাবলী পালন করা।

'তফসীর কুরতবী' অষ্টম খণ্ড, সূরা তৌবার উক্ত আয়াতের অধীনে, ১৩১ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে : "কালা আবু হুরায়রাহ্ ওয়াযু-যাহ্হাকু হাযা ইন্দা নুযূলে ঈসা আলাইহিস সালাম ওয়া কালা সিদিউ যাকা ইন্দা খুরুজিল মাহ্দী"—অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রাহ্ এবং যাহ্হাক বলেছেন, 'এই ওয়াদা মসীহর নযুলের সময় পূর্ণ হবে'। সিদি বলেছেন, 'ইমাম মাহদীর আবির্ভাবকালে উক্ত ওয়াদা পূর্ণ হবে'। অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে সকলের কথা এক ও অভিন্ন।

অতএব, এখন আমি উক্ত বিষয়-বস্তু সম্পর্কিত আয়াতটির দিকে পুনরায় ফিরে যাচ্ছি। আল্লাহ্তা'লা ওয়াদা করেছেন যে, "মুতিম্মু নূরিহী"—আমার নূরকে পরিপূর্ণ করব, অর্থাৎ উহার চরম ও পরম সীমায় পৌঁছাব। আর এই নূরকে চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছাবার উদ্দেশ্যে খোদাতা'লা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দীকে (আঃ) 'ওসীলা' (মাধ্যম) স্বরূপ নির্ধারণ করেছিলেন। সেজন্যে অবধারিত ছিল যে, তিনি হযরত আকদাস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) গোলামীতে এই মর্যাদায় ও সৌভাগ্যে ভূষিত হবেন, যাতে উক্ত ওয়াদা তাঁর মাধ্যমায় বাস্তবায়িত হয় এবং তাঁর মান্যকারীগণ যাতে উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ ক'রে তাদের সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করেন। অতএব, জামাতে আহমদীয়ার সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। সে উদ্দেশ্যই হচ্ছে 'ইতমামে নূরে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' (মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নূরের পূর্ণ বিস্তার সাধন)। 'ইতমামে নূরে মুস্তাফা' সেই অর্থে, যা আমি বর্ণনা করে এসেছি, অর্থাৎ কেবল একটি নয় বরং অপরাপর সকল ধর্ম ও মতবাদের উপরে উহার প্রাধান্য বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা। অতএব এদিক থেকে নূরের বিচ্ছুরণ ও বিস্তার আমাদের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছে। বস্তুতঃ এই নূরের বিস্তার সাধন সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা এই নূর থেকে অংশ লাভ করি। কেননা, যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের দ্বারা প্রাধান্য বিস্তারের এখানে কোন প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না। উহা এক বিষয় এবং নূরের প্রাধান্য বিস্তার হচ্ছে আরেক বিষয়। সেজন্যেই তো আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নূরের সূত্র ধরে বিষয়টি পেশ করা হয়েছে। কেননা, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত রূপে বুঝিয়ে গেছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্র (সাঃ) নূর হচ্ছে চিরন্তন এবং আজও সজীব ও ক্রিয়াশীল।

অতএব, যখন আমরা বলি যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একজন জিন্দা রসূল, তখন মুশরেকদের অর্থে (ও তাদের ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী) তা বলি না, বরং কুরআন করীমে তাঁর শান ও মর্যাদার সম্পর্কে বর্ণিত পবিত্রবাণী অনুযায়ী বলি। আর তদনুযায়ী তাঁর নূরই প্রাধান্য লাভ করবে। এই নূর বলতে কী বুঝায়? তা হচ্ছে গুণাবলীর নামান্তর, যেমন বিগত খোৎবাসমূহে আমি পবিত্র কুরআন থেকে উদ্ধৃত বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণ করে এসেছি। ঐশীগুণাবলী, যা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্তায় এরূপে আলোক সম্পাত করেছে যে তিনি যেন মূর্তিমান নূর হয়ে যান। সে নূরই প্রাধান্য বিস্তারের সৌভাগ্যে ভূষিত হবে। এখানে যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের কোন বিতর্ক নেই। এই নূর হচ্ছে চারিত্রিক উৎকর্ষের নূর। এই নূর যখন দীপ্তিমান হয়, তখন দর্শকদের দৃষ্টিকে আলোদান করে। অন্ধকাররাশীকে আলোকমালায় এবং রাত্রিকে দিবসে রূপান্তরিত করে।

(চলবে)

ঈদুল আযহিয়ার খুতবা

হজ্জের নামে মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়ানো ও বিভেদ সৃষ্টি হজ্জের বিষয়-বস্তুর সাথে বিদ্রোহ করার শামেল।

[১৯৯৪ সনের ২১শে মে তারিখে ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড যুক্তরাজ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত ঈদুল আযহিয়ার খুতবা]

অনুবাদ: মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তাশাহ্হুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠ করার পরে হুযুর আইয়্যাদাহুল্লাহুতা'লা বেনাসরিহিল আযীয সূরা আল্ হজ্জের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন:

ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام - فالهكم اله واحد فله اسلموا - وبشر المخبتين ٥

الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيمى الصلوة - ومما رزقنهم ينفقون ٥

আমি সূরা আল্ হজ্জের ৩৫ ও ৩৬ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এর অনুবাদ এই যে, প্রত্যেক জাতি ও মিল্লাতের জন্যে আমরা কুরবানীর এক পন্থা নির্ধারণ করে রেখেছি। লিইয়াযকুরুস্ মাল্লাহি 'আলা মা রাযাকাহুম—যা কিছু আল্লাহ্ তা'লা তাদের রিয্ক হিসেবে দিয়েছেন তারা যেন তার ওপরে আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করে। মিম্ বাহীমাতিল আন'আম—ঐসব জন্তু-জানোয়ারের মধ্য থেকে যা চতুষ্পদ।

যখন ওগুলোকে তারা খোদার উদ্দেশ্যে খোদার সন্তুষ্টির খাতিরে তাঁর অনুমতিক্রমে কুরবানীর জন্যে উপস্থাপন করে অথবা খাবার জন্যে ব্যবহার করে তখন উহাদের ওপরে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা উচিত। ফা ইলাহুকুম ইলাহুন ওয়াহিদুন—আর তোমাদের খোদা এক-ই খোদা। ফালাহু আস্লিমূ—সুতরাং তাঁরই সমীপে আনুগত্যের সাথে ঝুঁকো। ওয়া বাশ্শিরিল মুখবিতীন—আর ঐসব লোক যারা বিনয় অবলম্বন করে খোদার সমীপে ঝুঁকে তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করো। যখন আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা হয় তখন ঐ সব লোকের অন্তর থর থর করে কাঁপতে আরম্ভ করে আর যে দুঃখ-কষ্টই তাদের পৌঁছে তারা তার ওপরে ধৈর্যশীল থাকে এবং নামাযকে প্রতিষ্ঠা করে এবং যে রিয্ক তাদেরকে আমরা দিয়েছি তাথেকে তারা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করে। অর্থাৎ আল্লাহ্র নামে পুণ্য কাজে ঐ রিয্ক থেকে খরচ করে।

অতএব এ শর্ত ঐসব লোকের জন্যে যারা এক-অদ্বিতীয় খোদার বান্দা এবং এসব শর্তাবলী যা কিনা তাদেরকে মানবীয় দৃষ্টিকোণে এক হাতে সমবেত করে এক-অদ্বিতীয়

খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অর্থাৎ খোদার নামের উচ্চারণে অন্তরগুলো থর থর করে কাঁপা, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাম শুনলে অন্তরে শিহরণ সৃষ্টি হওয়া। এর অর্থ এই নয় যে, সর্বদা সব সভা-সমিতিতে যখন খোদার নাম উচ্চারিত হয় তখন এ রকম ঘটনা ঘটে। কিন্তু এর অর্থ এই যে, তাদের জীবনে কতক এমন মুহূর্ত আসে যে, আল্লাহ্‌র নাম শুনতেই ভালবাসা, প্রেম ও তাঁর প্রভাবে শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং অন্তরে মনে হয় যেন এক প্রকার ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। এসব লোকদের বেলায় বলা হয়েছে যে, তারা ধৈর্যশীল। এই একটি গুণ যদ্দারা তাদেরকে চেনা যায়। আর তারা নামায প্রতিষ্ঠা করে। অর্থাৎ (আল্লাহ্‌র) ইবাদত করে। নামাযের অর্থে এই কথা মনে করা জরুরী নয় যে, এখানে ইসলামী নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এখানে সারা দুনিয়ার সকল জাতির উল্লেখ করা হচ্ছে। আর যা কিছু আমরা তাদেরকে দিই তাথেকে খরচ করে। এই তিনটি মৌলিক গুণ যা কিনা তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার সাথে সংযুক্ত করে। এবং এ গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়। আর যতটা দুনিয়ার ধর্মসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় ওগুলো যে কোন জাতি বা ভূখণ্ডের যে কোন অংশের সাথে সম্পর্ক রাখুক না কেন, যে কোন যুগের সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন এ সবের মধ্যে এই গুণাবলী সাধারণভাবে আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। অতএব হজ্জ সম্পর্কে ঐসব কথাই বলা হচ্ছে যা কিনা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ঐ যে প্রথম আয়াতটি যার আমি তেলাওয়াত করেছি উহার বিষয়-বস্তুই এই নির্ধারণ করা হয়েছে—ওয়া লিকুল্লি উম্মাতিন জা'আলনা মানসাকান লিইয়াযকুরুস্‌মাল্লাহি—আমরা প্রত্যেক জাতির জন্যে এক কুরবানীর পদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছিলাম।

এই বিষয়-বস্তু কেবল মুসলমানদের সাথেই সম্পর্ক রাখে না বরং সমগ্র মানব-মণ্ডলীর সাথে সম্পর্ক রাখে। আর হজ্জের বিষয়-বস্তুও কেবল মুসলমানদের সাথেই নয় বরং সমগ্র মানব-মণ্ডলীর সাথে সম্পর্ক রাখে। এজন্যে কুরআন মজীদ যেখানে খোদার প্রথম ঘরের নির্মাণ সম্পর্কে উল্লেখ করেছে যা কিনা 'বাক্কা-তে নির্মিত হয়েছিলো তখন বলা হয়েছে, ইহা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে। 'ইন্না আওওয়ালা বায়তিউঁযি'আ লিন্নাসি লাল্লাযী বিবাক্কাতা'—ঐ প্রথম ঘর যা কিনা মানব-মণ্ডলীর পথ-প্রদর্শনের জন্যে নির্মাণ করা হয়েছে উহা মক্কাতে অবস্থিত। (সূরা আলে ইমরান: ৯৭ আয়াত)। (মক্কার প্রাচীন নাম ছিলো বাক্কা—অনুবাদক)। অতএব হজ্জ প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের উম্মতে ওয়াহেদা—একই উম্মত বা মণ্ডলী হওয়ার চিহ্ন নয় বরং গোটা মানব জাতির উম্মতে ওয়াহেদা হওয়ার চিহ্ন। আর এদিক থেকে হজ্জের বিষয়-বস্তু বিশ্বের প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পাওয়া যায়, যেন বিশ্বের সকল জাতিকে এক হাতের উপরে সমবেত করার লক্ষ্যে প্রারম্ভ থেকেই তৈরী করে রাখা হয়েছিলো। যদি

খৃষ্টানদের প্রতি আপনি লক্ষ্য করুন তাহলে দেখবেন যে, খৃষ্টানদের মধ্যেও হজ্জের বিষয়-বস্তু না কেবল পাওয়াই যায় বরং বিভিন্ন সময়ে এত বেশী হজ্জ করা হয় যে, সম্ভবতঃ ধর্মীয় ইতিহাসে এথেকে অধিক হজ্জের স্থানসমূহ আপনাদের চোখে প্রতিভাত হবে না যতটা খৃষ্টান জাতির মধ্যে দেখা যায়, বিশেষ করে রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে। বিভিন্ন সাধু পুরুষগণের নামে বিভিন্ন হজ্জের স্থান নির্মাণ করে রেখেছে। কোথাও ঐসব লোক নগ্ন পায়ে হেঁটে হেঁটে চলে যায়। কোথাও অন্য কিছু রসুম-রেওয়াজ পালন করতে করতে চলে যায়। মোট কথা এই যে, শ' শ' বরং হাজার এমন স্থানসমূহ খৃষ্টান জাতি পবিত্র বলে মনে করে যায়, যেখানে তারা বছরে বা কয়েক বছরে একবার হজ্জ করাকে নিজেদের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করে। ইহুদীদের হজ্জ প্যালেষ্টাইনে যেরুশালেমের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং গোটা দুনিয়া অবহিত যে, যেরুশালেমের পবিত্র ভূমিতে তীর্থ গমন এবং সেখানকার ক্রন্দন দেয়ালে (Wailing wall—অনুবাদক) যেমন মাথা ঠোকানো এবং মসীহ্-এর আগমনের জন্যে দোয়া করা—ইহা তাদের এক প্রকারের হজ্জ। আর এভাবে হাইকলে সুলায়মানী [যেরুশালেমে হযরত সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক নির্মিত ক্ষুদ্র মসজিদ —অনুবাদক] রয়েছে এর দর্শন ও অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা—ইহুদীদের মধ্যেও হজ্জের ন্যায় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিলক্ষিত হয়। এবং যতটা হিন্দুদের সাথে সম্পর্কিত, হিন্দুস্তানের সবচে' বড় জাতি হলো হিন্দু। আর ধর্মীয় দিক থেকে তাদের মধ্যেও অনেক এমন পবিত্র স্থানসমূহ রয়েছে যেখানে রীতিমত প্রত্যেক বছর হজ্জব্রত পালন করা হয়। যেমন উহাকে তীর্থ বলা হয়। পবিত্র স্থানে যাওয়া এবং হজ্জ করাকে তীর্থ যাত্রা বলে। হিন্দুস্থানে ৬৮টি এমন স্থান রয়েছে যা কিনা হয় কোন না কোন সম্প্রদায়ের হজ্জের স্থান অথবা সমগ্র হিন্দু জাতি উহাকে পবিত্র স্থান বলে মনে করে। এর মধ্যে সবচে' পবিত্র স্থান হলো বানারস। বানারসে প্রতি বছর কমপক্ষে ১০ লক্ষ লোক হজ্জের জন্যে সমবেত হয়ে থাকে। এর পুরো তালিকা তো আমি আপনাদের পাঠ করে শুনাতে পারছি না কিন্তু তীর্থযাত্রার যে দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ মৌলিক স্থানের কথা আমি বল্লাম তন্মধ্যে বানারস সবচে' বড় আর এর পরে হলো জগন্নাথপুরী। আর আশ্চর্যের বিষয় হলো এই যে, এর প্রত্যেক স্থানে হজ্জের সাথে কম বেশী এক প্রকারের আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রত্যেক হজ্জের সাথে কুরবানীর একটি বিষয়-বস্তু অবশ্যই রয়েছে এবং রয়েছে দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ যাকে হজ্জ থেকে আলাদা করে ভাবাই যায় না।

দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে হজ্জ পালন করা হয় তাতে মাথা মুড়োনোও অন্তর্ভুক্ত। যেমন, যখন আপনি হিন্দুদের তীর্থ যাত্রার প্রতি দৃষ্টি দেন তখন দেখবেন যে, তারা অধিক সংখ্যায় মাথা মুড়োচ্ছে। নিদর্শনস্বরূপ একটি টিকি অবশিষ্ট রেখে দেয়া হয়।

অবশিষ্ট সমগ্র মাথা যাকে তারা খোদা মনে করে তার (সন্তুষ্টির) খাতিরে মুড়িয়ে ফেলে। আর এভাবে ঐ পবিত্র স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করে থাকে। সেখানে নানা প্রকার ভজন গেয়ে থাকে। নিজের পোষাক-পরিচ্ছদকে কম করে দেয়। কতক কেবল একখানা চাদরাবৃত হয়ে হজ্জ পালন করে অর্থাৎ তীর্থ যাত্রা করে। হজ্জের সাথে গোসল (স্নান)-ও সম্পৃক্ত। উৎস স্থান থেকে আরম্ভ করে শেষ স্থান পর্যন্ত বানারসের পানিকে পবিত্র মনে করা হয় এবং ঐ পানিকে তাবারক (কল্যাণমণ্ডিত) হিসেবে এমনভাবে ঘরে নিয়ে যায় যেভাবে মুসলমানগণ হজ্জ আদায় করে যমযমের পানি বোতলে ভরে নিজেদের ঘরে নিয়ে যায়। তাই ইহা একটি আশ্চর্যজনক বিষয় যা কিনা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। আর কোন গ্রন্থ এর উল্লেখ করে নি। আপনি সারা দুনিয়ার ধর্ম অনুসন্ধান করে দেখুন, হজ্জের উল্লেখ তো সেখানে পাবেন, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গে। 'হজ্জ' শব্দের ব্যবহার হোক বা না হোক কিন্তু এমন ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে যার মধ্যে একটি পবিত্র স্থানের দর্শন অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে বহু লোক এমন আছে যারা যাবার সময়ে মাথা মুড়িয়ে ফেলে আর ইহাও একপ্রকার নিষ্ঠাপূর্ণ কাজ এবং নিজেকে সঁপে দেওয়ার একটি চিহ্ন। আবার কাপড়-চোপরে আড়ম্বরহীনতা, একটি চাদরে আবৃত হওয়া। আবার স্নান করা এবং সেখান থেকে কোন পবিত্র বস্তু কল্যাণমণ্ডিত মনে করে নিয়ে আসা। সেখানে কুরবানী করা বা মানব-গোষ্ঠির কল্যাণার্থে প্রচুর দান-খয়রাত করা এবং মানব-গোষ্ঠির খাতিরে বা আল্লাহ্‌তা'লার খাতিরে মানব-মণ্ডলীর সেবা করা। এসব বিষয়-বস্তুই হজ্জের সাথে সম্পর্কিত। **অতএব ইহা একটি বিশ্বজনীন ব্যবস্থাপনা যা কিনা আল্লাহ্‌তা'লা মানব-মণ্ডলীকে শেষ পর্যন্ত এক-ই হাতে সমবেত করার জন্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন।**

কিন্তু ইহা একটি আশ্চর্যজনক কথা এবং মুসলমানদের জন্যে চরম দুঃখের বিষয় যে, ঐ হজ্জ যা কিনা কতক বিশেষ জাতি বা দেশ বা ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ছিলো কিন্তু বিশ্বজনীন ছিলো না, তাদের হজ্জের স্থানসমূহে তো সমগ্র মানব-মণ্ডলীর প্রবেশাধিকার রয়েছে যেন তারা আসে এবং এভাবে হজ্জ করে। কিন্তু ঐ হজ্জ যা কিনা সর্বপ্রকার হজ্জের চূড়ান্ত মার্গ ছিলো, যার প্রস্তুতির খাতিরে সকল মানব-গোষ্ঠিকে, সকল ধর্মকে তরবীয়ত দেয়া হচ্ছিলো সেখানে এখন বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছে এবং তালা লেগে গিয়েছে, পাহারাদার বসে রয়েছে যেন মুসলমান ব্যতিরেকে আর কাউকে হজ্জের অনুমতি দেয়া না হয়। বিস্মিত হতে হয় এবং মানুষ দুঃখে বিচলিত হয়ে যায়। আশ্চর্য্যজনক কথা এই যে, তারা একটি হজ্জ যার সম্পর্কে কুরআন করীম দাবী করছে যে, ঐ ঘরের চারদিকে প্রদক্ষিণ করা হয় যা 'আওওয়ালা বায়তিউঁ'যি'আ লিন্নাসি'—প্রথম ঘর যা সমগ্র মানব-গোষ্ঠির

জন্যে তৈরী করা হয়েছে অথচ সেখানে সমগ্র মানব-গোষ্ঠির প্রবেশাধিকার নেই। এবং ঐ ঘর যা কিনা কতক সীমাবদ্ধ জাতির জন্যে কতক বিশেষ ধর্মের জন্যে তৈরী করা হয়েছিলো, তাদের অন্তর এতটা প্রসারিত যে, তারা সমগ্র দুনিয়াকে আহ্বান করছে যে, নিঃসন্দেহে আস এবং আমাদের মত হজ্জ করো। এ শর্ত সকলের জন্যে সাধারণ-ভাবে গৃহিত। যদি আপনি হিন্দুদের তীর্থে যাত্রা করেন অর্থাৎ হজ্জের স্থানসমূহে দর্শনার্থে গমন করেন তাহলে ইহা স্বাভাবিক কথা যে, তারা ইহা কমই পসন্দ করবে যে, আপনারা সেখানে গিয়ে 'নারায়ে তকবীর' ধ্বনি দিবেন এবং মুসলমানদের ন্যায় সেখানে আপনার রীতি অনুযায়ী ইবাদত করবেন। যদি আপনি খৃষ্টানদের কোন হজ্জে যোগদান করতে চান তাহলে ইহা স্বাভাবিক কথা যে, তারা ইহা পসন্দ করবে না। যদি আপনারা তাদের ইবাদতের পদ্ধতি অবলম্বন করে সেখানে যান তাহলে এতে তাদের কোন গরজ নেই যে, তারা আপনার ধর্ম সম্বন্ধে জাতি সম্বন্ধে এবং কোন্ দেশের সাথে সম্পর্ক রাখেন সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাদের ন্যায় তাদের পবিত্র স্থানগুলোতে অবশ্যকরণীয় ইবাদত আদায় করলে তো সবার জন্যে স্পষ্ট অনুমতি রয়েছে যে, উৎসাহের সাথে আসুন এবং যা চান তাই করুন। কিন্তু যে হজ্জের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আমি উল্লেখ করছি সেখানে এ বিতর্ক নেই যে, কেউ মুসলমানদের ন্যায় হজ্জ করে বা করে না, বিতর্ক তো এই যে, তার ধর্ম কী? যদি তার ধর্ম অন্য কিছু হয় আর পুলিশের খোঁজ-খবরের পরে ইহা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তার আসল ধর্ম খৃষ্টান ছিলো তাহলে তাকে কড়া শাস্তি প্রদান করা হবে।

অতএব কীভাবে বিষয়-বস্তু উল্টে গেছে। নীচ ওপর হয়ে গেছে। ঐ হজ্জের স্থান যা কিনা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্যে তৈরী করা হয়েছিলো তা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্যে উন্মুক্ত থাকলো না। আর ঐ সব স্থান যা বিশেষ জাতির জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিল উহা সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে তাদের সেখানে আসার ও তীর্থ যাত্রার অনুমতি দিচ্ছে। বরং যদি কেউ আসে তাহলে তারা তার ওপরে গর্ব অনুভব করে থাকে। তাই হজ্জের এই যে কেন্দ্রীয় বিন্দু রয়েছে উহাকে আপনারা স্মরণ রাখুন এবং জামাতে আহমদীয়াকে সব সময়ের জন্যে এ বাণী অন্তরে গেঁথে নেয়া দরকার। কেননা, আমাদের ইসলামের সত্য স্বরূপকে দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে সঞ্জীবিত করতে হবে এবং সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে কুরআনের শিক্ষার প্রতি আহ্বান করতে হবে। আর কুরআনের শিক্ষার ঐ সব সুন্দর দিকগুলোর প্রতিও যা কিনা কতক লোকের গোড়ামির কারণে চাপা পড়ে গেছে, যেভাবে কোন সুন্দর জিনিসের ওপরে আস্তে আস্তে নোংরা ময়লা পড়ে যায়, উহাকে পরিষ্কার করতে হয়, উহার ময়লা দূর করতে হয়। কা'বাকে এভাবে আধ্যাত্মিক গোসল দিতে হবে। যে গোসলের পরে ঐ খানা কা'বা উদ্ভাসিত হবে যা কিনা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অন্তরে জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়েছিলো। যাকে ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) নির্মাণ করেছিলেন

আর ঐসব অপরিচিত লোক যাদের নাম নেয়া হয়নি এবং অন্তর সর্বদা বিস্ময়ের সাথে তাদের কল্পনা করে যে, কুরআন করীমে বেনামে তাদের উল্লেখ এসেছে। আওওয়ালা বায়তিউ'যি'আ লিন্নাসি—কতক খোদার বান্দা এরূপ ছিলেন যারা উক্ত ঘর নির্মাণ করেছিলেন। তারা কারা ছিলেন আমরা তা অবহিত নই। কতদিন আগের কথা আমাদের কিছুই জানা নেই। কিন্তু ঐ প্রথম ঘর যা কিনা সমগ্র মানব-মণ্ডলীর জন্যে সাধারণভাবে তৈরী হয়েছিলো নিশ্চয় ঐ যুগে তৈরী হয়েছিলো যখন মানব-মণ্ডলী স্বয়ং একটি পরিবারের মত ছিলো যখন কিনা মানবতার উন্মেষ ঘটেছিলো, যখন কিনা পশু-জগৎ থেকে এক মহান উত্থানের ফলে, এক বিস্ময়কর বিপ্লবাত্মক উত্থানের ফলে মানবীয় সত্তা—প্রথম বারের মত মুনাস্‌সা শহুদ (ঐ স্থান যেখানে কোন বস্তুর বিকাশ দৃশ্যমান হয়)-এ প্রতিভাত হয়েছিলো। এ জগতে এক বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। আচম্‌কা অবোধ পশুদের পরিবর্তে, যারা কিনা তাদের মনের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে অপারগ ছিলো তারা এমন এক সত্তায় পরিণত হলো যা "সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা" ছিলো। তারা শুনতো এবং দেখতোও। তারা বলতো ও বর্ণনা করার শক্তি রাখতো। ঐ যুগ, যার প্রসঙ্গে আমি মনে করি যে, কুরআন করীমের এ আয়াত ইঙ্গিত করছে এবং এজন্যেই ঐ ঘরের একনাম "বায়তে 'আতীক"—রাখা হয়েছে। কুরআন করীমে এর বিভিন্ন নাম রয়েছে। এর মধ্যে একটি নাম "বায়তে 'আতীক"। অর্থাৎ প্রাচীনতম ঘর। এখন এটাও আশ্চর্য কথা যে, অন্যান্য কতক ধর্মেও 'আতীক বা প্রাচীন হবার দাবী উহাদের পবিত্র স্থানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে। আর যতটা হিন্দু-ইজমের সাথে সম্পর্ক তাদের নিকট তো তাদের ধর্মীয় পুস্তকাদিও অর্থাৎ পবিত্র বেদ এতই প্রাচীন যে, যুগাবর্তের পূর্বেও ছিলো এবং বহু প্রাচীনও। এবং তারা মনে করে যে, তাদের সভ্যতাও সবচে' প্রাচীন এবং তাদের পবিত্র স্থানসমূহও সবচে' প্রাচীন। অথচ যতটা বানারাসের সাথে সম্পর্ক রাখে জ্ঞাত মানব সভ্যতার ইতিহাস আমাদের বলে দেয় যে, বানারস প্রথমবার মসীহ (আঃ)-এর ছয় শ' বছর পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করে। আর এর সম্মানিত হওয়ার তারিখ খৃষ্ট পূর্ব ছয়শ' বছর পূর্বে শুরু হয় অর্থাৎ হযরত বুদ্ধের (আঃ) একশ' বছর পূর্বে। কিন্তু প্রাচীনতার দাবী তবুও মজুদ আছে। এজন্যে আমি মনে করি যে, প্রাচীনতার দাবী এসব জাতি প্রাচীন জাতিসমূহ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত আর প্রাচীনতা অর্থে ঐ একটি ঘরই যাকে কিনা "বায়তে 'আতীক" বলা হয়েছে এবং ঐ ঘরের সাথে সংশ্লিষ্ট বাণীই প্রাচীনতম বাণী এবং উহাই অস্তিত্ববান যা কিনা প্রথমে অস্তিত্বে এসেছে আর উহা ইব্‌রাহীমের ধর্ম যা কিনা ইব্‌রাহীমের আগেই অস্তিত্বে এসেছিলো।

যখন আমরা ইহা শুনি যে, হিন্দুদের এই দাবী যে, বেদ সৃষ্টির পূর্বে, মানুষ বা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব থেকে মজুদ আছে। তখন বাহ্যতঃ আশ্চর্যজনক বলে মনে হয় এবং কতক

লোক বোকামীর কারণে এ ধারণাকে একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণা মনে করে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। কিন্তু আসল ঘটনা এই যে, সর্বপ্রকার ঐশীবাণী, তার যে কোন নামই রাখা হোক না কেন, উহা সব সময় থেকেই অস্তিত্ববান, ঐ অর্থে যে, 'লৌহে মাহফুযে' (সংরক্ষিত পাত্রে) ঐ বাণী মজুদ ছিলো। তখনও বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ঐশী-বাণী যে নামেই দুনিয়াতে প্রকাশিত হোক না কেন ঐ অর্থে উহা মজুদ ছিলো। এই কারণেই অর্থাৎ এ তাৎপর্য উপলব্ধি করে প্রাচীন কালে অর্থাৎ ইসলামের মধ্যবর্তী যুগ-সমূহে এ কথার ওপরে বহু বিতর্ক হয় যে, কুরআন কী সৃষ্ট বস্তু না সৃষ্ট বস্তু নয়। এবং এ বিতর্ক এতখানি চরম পর্যায়ে উপনীত হয় যে, যেসব লোক এতে বিশ্বাস করতো যে, কুরআন সৃষ্ট বস্তু, যখন তারা শক্তিশালী হলো তখন ঐসব লোকদের তারা বেত্রাঘাত করলো। তাদেরকে ফাঁসীতে চড়ালো। কখনও কখনও তাদের কবরগুলোকে উপড়ে ফেলা হয়েছে। আর তাদের মৃত্যুর পরে তাদের কঙ্কালকে ফাঁসীতে চড়ানো হয়েছে এজন্যে যে, তারা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কথা বলেছে। আর এসব লোক যারা ইহা বুঝতে ছিলো যে, খোদার বাণী সব সময় থেকে আছে। উহাকে সৃষ্ট বলা কুরআনের বা ঐশী-বাণীর অসম্মানজনক কথা। যখন তারা শক্তিশালী হলো তখন ঐসব লোক যারা বলতো যে, কুরআন সৃষ্ট বস্তু তাদেরকে বেত্রাঘাত করা হতো এবং এমন সব দুঃখজনক ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে এই বিষয়ের ওপরে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধি তাক্ লেগে যায়। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল যিনি চারটি ফেকাহর মধ্যে একটি ফেকাহর মহান ইমাম। আজকের দুনিয়ায় আমরা চিন্তাও করতে পারি না যে, তাঁর বিরুদ্ধে কোন সরকার ফতওয়া দিতে পারে বা কতক উলেমা কুফরীর ফতওয়া দিতে পারে। তাঁর এই ধর্ম-বিশ্বাস ছিলো যে, ঐশী-বাণী প্রাচীন কাল থেকে ছিলো না বরং আদিকাল থেকে আছে আর ঐ বস্তু যা কিনা খোদার সত্তার সাথে সবসময়ের জন্যে মজুদ থাকে। উহা এক প্রকার Blue Print (নীল নক্শা) যার মধ্যে উহা সংরক্ষিত থাকে। ইহাকে সৃষ্টি বলা যেতে পারে না। সুতরাং এ অপরাধে তাঁর পা শৃঙ্খলিত করে এবং হাতে ভারী হাত কড়া পরিয়ে তাঁকে কাযীর সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। কাযীর নিকট থেকে ফতওয়া জারী করা হয়েছে যে, এই ব্যক্তি প্রথম প্রকারের মুরতাদ। দুনিয়াকে পথভ্রষ্ট করছে ও প্রতারণা করছে। তাই তাঁর জন্যে এই শাস্তি নির্ধারণ করা হলো যে, প্রচণ্ড রোদে তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বসিয়ে দেয়া হলো এবং জল্লাদ তাঁকে বেত্রাঘাত করতে থাকলো। আর যখন এক জল্লাদ ক্লান্ত হয়ে যেতো অপর এক জল্লাদ তাকে বেত্রাঘাত করার জন্যে এসে যেতো। বেত্রাঘাত চলাকালী সময়ে তিনি বলতে থাকতেন, আল্লাহ্র বাণী সৃষ্ট নয়, আল্লাহ্র বাণী সদা খোদার সাথে বিদ্যমান রয়েছে।

অতএব 'আতীক'-এর অর্থ বুঝতেও লোকেরা বড় বড় ভুলের শিকার হয়েছে এবং খোদার কাজ নিজেদের হাতে নিয়েছে এবং খোদার পবিত্র বান্দাদেরকে দুঃখ দিতে দুঃসাহস দেখিয়েছে যেন খোদায় পরিণত হয়ে গেছে এবং এ দুনিয়াতেই হাশর প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে। কিন্তু আসল কথা এই যে, মানুষকে পরিশেষে মানবতা শিখতে হবে। কোন ঐশী-শিক্ষা মানবতাকে মিটিয়ে দিতে এবং উহার সাথে সংঘাত বাধাতে পারে না। ইহা একটি মৌলিক নীতি। এতে কখনও কোন পরিবর্তন হয়নি বা আগামীতে কখনও হবে না। অতএব প্রত্যেক ঐ সত্যশিক্ষা উহা পরিভাষাগতভাবে ঐ অর্থেই গ্রহণীয় হবে যা প্রত্যেক স্বভাব অর্থাৎ মানবীয় স্বভাব গ্রহণ করে। কেবল মেধাগত অনুশীলনের ফলে অর্থ যেন না বের করা হয় বরং মানুষের স্বভাবের সাথে গভীর সংযোগপূর্ণ অর্থ যেন করা হয়। তাই এসব অর্থে যখন আমরা খানা কা'বাকে প্রাচীন দেখি এবং অন্যান্য কতক ধর্মের দাবীকে এর তুলনায় দেখি—যখন তারা বলে যে, আমাদের কেন্দ্র প্রাচীন কাল থেকে রয়েছে তখন তার মধ্যে কোন উত্তেজনাকর কথা নেই, কোন রাগ ও উত্তেজিত হওয়ার কথা নেই। যদি হিন্দুরা নিজেদের পবিত্র স্থানসমূহকে প্রাচীন বলে বা তাদের বেদকে প্রাচীন বলে তাতে কোন দোষ নেই। কুরআন করীম এ সমস্যাকে এভাবে সমাধান করেছে যে, প্রাচীন ঐ জিনিষকে বলে যার কোন নাম রাখা হয়নি এবং খোদার সাথে ও মানব-মণ্ডলীর সাথে তা সম্পর্কযুক্ত করে দিয়েছে। 'ইন্না আওওয়ালা বায়তিউঁ যি'আ লিন্নাসি লিল্লাযী বিবাক্কাতি' —ঐ প্রথম গৃহ যা মানব-মণ্ডলীর খাতিরে তৈরী করা হয়েছে। এর মধ্যে সমগ্র মানব-মণ্ডলী অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে হিন্দুও অন্তর্ভুক্ত, খৃষ্টান এবং শিখও অন্তর্ভুক্ত। ইহুদীরাও আছে, যরথুস্ত্রীয়রাও আছে, বুদ্ধরাও আছে, তাওবাদী (Tao), কনফুসিয়সরাও অর্থাৎ কিনা সকল ধর্মের লোকগণ, যাদের আপনি চিন্তা করতে পারেন তারা সব এ আয়াতের কল্যাণের আঁচলের অন্তর্ভুক্ত, এ কল্যাণের ছায়াতলে রয়েছে। আর আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—এদের সকলের খাতিরে আমরা প্রথম গৃহ এখানে তৈরী করতে অনুমতি দিয়েছিলাম অথবা এমন ঘটনা হয়েছে যে, প্রথম ঘর এখানে বানানো হয়েছে। এখন আল্লাহ্‌তা'লা ভালভাবে অবহিত আছেন তারা কোন্ লোক ছিলো? তাদের ধর্মই বা কী ছিলো? তাদের কোন নাম বলা হয় নি। আর আমাদের চিন্তারও দরকার নেই। কেননা, পরিশেষে নাম নিয়ে আবার ঝগড়ার সৃষ্টি হয়। তাদের ধর্ম উহাই যা এসব আয়াত করীমার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। উহা এই যে, তারা ঐ সব লোক ছিলো যারা খোদার খাতিরে খোদার কাছ থেকেই কুরবানী করার পদ্ধতি শিখেছে। আর ঝুঁকে ও বিনয়ের সাথে এসব রাস্তা অনুসরণ করেছে এবং পরে এতে যেসব গুণাবলী দৃশ্যপটে এসেছে উহা ছিলো এই যে, আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাদের হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো, আল্লাহ্‌র ভালবাসা তাদের

অন্তরের উপরে বিজয় লাভ করেছিলো। আর খোদাতা'লার নাম শুনে কখনও কখনও তাদের মনের মধ্যে একটি ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়ে যেতো। এরাই ঐ সব লোক যখনই দুনিয়াতে তাদের দুঃখ-কষ্ট ক্লিষ্ট করতো তারা ধৈর্য ধারণ করতো কিন্তু বিলাপ করতো না। ইবাদত প্রতিষ্ঠা করতো এবং মানবমণ্ডলীর জন্যে আল্লাহ্‌র (সন্তুষ্টির) খাতিরে খরচ করতো।

অতএব ইহা ঐ সব গুণাবলী যেগুলোর খাতিরে যেগুলো ছড়ানোর জন্যে আমাদের বিশ্বব্যাপী জেহাদ করতে হবে। যদি আমরা এই জেহাদ করি ও খোদার ইবাদতকে খোদার খাতিরে নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠা করি এবং এমন অন্তর সৃষ্টি করি যেন তা আল্লাহ্‌র ভালবাসায় আবদ্ধ হয় আর এমন ধৈর্যশীলদের তৈরী করি যাদের নিকট প্রত্যেক বিপদ খোদার ভালবাসায় সহজ বলে প্রতীয়মান হয়। ধৈর্যের এ পরিচয় সম্বন্ধে সবার অবহিত হওয়া দরকার। আর এ হজ্জের ব্যাপারে ধৈর্যের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞাত করা খুবই জরুরী। কেননা, **হজ্জের সাথে ধৈর্যের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।** এর বিস্তারিত বিবরণে আজ আমি যাচ্ছি না। ভবিষ্যতে কখনও এ বিষয়ের ওপরে বিস্তারিত আলোকপাত করবো। কিন্তু আপাততঃ এটা বলা আবশ্যক মনে করি যে, হজ্জের সাথে ধৈর্যের একটি গভীর ও স্থায়ী সম্পর্ক আছে। **ধৈর্যের ফলে হজ্জ লাভ হয় আর হজ্জের অনুষ্ঠান পালনের সৌভাগ্য লাভ হয়।** এ খানা কা'বাকে যখন নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছিলো তখন এর মধ্যেও তো ধৈর্যই ছিলো যা কিনা সবচে' অধিক কার্যকর ছিলো। হযরত হাযেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল খোদার খাতিরে যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন তাতো ধৈর্যেরই দৃষ্টান্ত ছিলো। পুত্র কীভাবে সেখানে পিপাসায় তীব্রতায় পা ঘষছিলো আর মা কীরূপ বিচলিত হয়ে সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে দৌড়া দৌড়ি করছিলেন! যেভাবে কোন দুঃখে কেউ পাগলপারা হয়ে যায় তেমনিভাবে। এবং এর পরেও খোদার খাতিরে তিনি ধৈর্য ধারণ করেছিলেন আর ঐ শিশুও ধৈর্য ধারণ করেছিলো। ফলে হজ্জের ঐ প্রবহমান ঝরণা যা কোন যুগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো পুনরায় নতুন করে সেদিন আবার প্রবহমান করা হলো। অতএব দুনিয়াতে ধৈর্যশীলদের সৃষ্টি করতে হবে এবং ধৈর্যের সম্পর্ক ঐশী-প্রেমের সাথে। কেননা, দুনিয়ার কোন দুঃখ-কষ্ট ভালবাসা ব্যতিরেকে সহজ-লভ্য হতে পারে না। আর যখন কিনা আল্লাহ্‌তা'লা বলেন—যখন তাদের সামনে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হয় তখন তাদের হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকে। তখন এর অর্থ এই যে, ভালবাসার প্রভাবে কম্পন উঠে এবং এরূপ লোকদের নিকট আল্লাহ্‌র খাতিরে যে কোন দুঃখ-কষ্ট সহজসাধ্য বলে প্রতিভাত হয়। কেননা, আল্লাহ্‌ সেই সত্তা যিনি সব কিছু দেবার মালিক। তিনিই কাম্য তিনিই উদ্দেশ্য তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তাই প্রিয়ের হাত যদি কিছু দিয়েও ফিরিয়ে নেয় তাহলে ঐ হাত যে

প্রত্যাখ্যান করে দেয় সে মূর্খ বলে পরিগণিত হবে। ঐ ব্যক্তি পাগল বলে পরিগণিত হবে যে ঐ হাতকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। সে ভালবাসার অযোগ্য। সে অসম্মানিত বলে প্রতীয়মান হবে যে ঐ হাতকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়। অতএব আল্লাহ্‌র হাত যা কিছু দেয় এবং পরে ফিরিয়ে নেয় অথবা তাঁর নিয়তি কতক শক্তিকে অনুমতি দেয় যে, তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করে তাহলে এসব কিছু বারীতা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে মোমেনকে বরদাস্ত করতেই হয়। কেননা, আল্লাহ্‌তা'লার ভালবাসার খাতিরে তার সব নিয়তির নিকটে মাথা নত করতেই হয়। ইহা একজন প্রেমিকের স্বভাব। এজন্যেই এর পরে পরেই আল্লাহ্‌তা'লা ধৈর্যের বিষয়-বস্তুর অবতারণা করেছেন এই বলে যে, এসব লোক যারা হজ্জের সুফল অর্থাৎ মিল্লাতে ওয়াহেদা (একই জাতি)-এর অংশ যা কিনা বিভিন্ন সব জাতির মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এদের মধ্যে সাধারণভাবে মর্যাদাসম্পন্ন লোক হলেন এরা অর্থাৎ যারা কিনা আল্লাহ্‌তা'লার ভালবাসার সাথে সংবদ্ধ, তাঁর কাছে পরিপূর্ণভাবে পরাভূত। আবার ঐসব লোকও যারা খোদার (সন্তুষ্টির) খাতিরে অন্যান্য যে কোন দুঃখ-কষ্ট উৎসাহের সাথে বরদাস্ত করে নেয়। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর নিকট স্বীয় পুত্র মোবারক আহমদ খুবই প্রিয় ছিলো। যখন তিনি মারা গেলেন তখন দেখুন কতই না প্রিয় কথার মাধ্যমে তিনি এ বিষয়-বস্তু বর্ণনা করেছেন।—

وہ آج ہم سے جدا ہوا ہے ہمارے دل کو حزیں بنا کر

মোবারক আমাদের অতি প্রিয় ছিলো,

সে আজ আমাদের অন্তরকে বিমর্ষ করে দিয়ে আমাদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কিন্তু পরে আবার বলেছেন—

بلانے والا ہے سب سے پیارا اسی پہ اے دل تو جاں فدا کر

যিনি ডেকে নিয়েছেন তিনি সবচে' প্রিয়,

তাঁর ওপরেই হে প্রাণ! তুমি অন্তর বিলীন করো॥

ঠিক আছে। যা ফিরে গেলো তা অতীব প্রিয় বস্তু ছিলো; কিন্তু যিনি ডেকে নিয়েছেন তিনি তো সবচে' প্রিয়। অতএব ঐ প্রিয়ের খাতিরে সামান্য প্রিয়কে বিদায় দিয়ে দেয়াকে ধৈর্য বলে এবং এর ওপরে হায় আফসোস না করাই ধৈর্য এবং এ আয়াতের ইহাই তাৎপর্য।

এর পরে বলেছেন—'ওয়াল মুকিমিস সালাতা' এসব লোক নামায প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহ্‌র সাথে ভালবাসা প্রকাশের একটি মাধ্যম হলো ইবাদত বা উপাসনা যা কিনা রীতিমত একটি পদ্ধতিতে আমাদেরকে শিখানো হয়েছে। যদিও যিক্‌রে ইলাহী বা ঐশী স্মরণও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ঐ স্পন্দন (নড়া-চড়া উঠা-বসা) যা-ই মানুষ স্বীয় জীবনে করে থাকে, যদি তা সম্পর্ক সৃষ্টির খাতিরে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্‌র

উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় তাহলে ঐসব কিছুই ইবাদতে রূপান্তরিত হয়। এমন কি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া আলেহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন—যদি তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের মুখে এক গ্রাস খাবার উঠিয়ে দাও এজন্যে যে, আল্লাহ্‌তা'লা চান যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো তাহলে ইহাও তোমাদের ইবাদত। তাই ইবাদতের বিষয়-বস্তু তো মানব জীবনের প্রত্যেক অংশে, প্রত্যেক অবস্থানে প্রত্যেক স্পন্দনে পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু ঐ ইবাদতের কথা বলা হয়েছে যা কিনা রীতিমত প্রত্যেক ধর্মে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে শেখানো হয়। ইহাকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। উহাকে সংরক্ষণ করতে হয়। আর ইহাই রীতিমত ইবাদত। ইহা প্রেমের প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রেমের ফলে রীতিমত একটি পন্থায় স্বীয় প্রেমাস্পদের দোর গোড়ায় উপস্থিত হওয়া—এরই নাম ইবাদত। তাহলে পরে তারা ইবাদত করে আর এ ইবাদত তাদেরকে কী শিখায়। ধৈর্যের আর একটি বিষয়-বস্তু আছে যা কিনা এখানে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে ধৈর্যের এ বিষয়-বস্তু ছিলো যে, স্বীয় প্রেমাস্পদের খাতিরে ঐ সব জিনিষ যা তোমাদের হাত থেকে যেতে থাকে যার ওপরে তোমাদের কোন এখতিয়ার নেই সেগুলো হাড়ানোর জন্যে হা হুতোশ করো না বরং তোমাদের প্রেমাস্পদের খাতিরে ঐ ক্ষতিকে গ্রহণ করে নাও এবং মাথা পেতে মেনে নিতে প্রস্তুত হও। এর ফলে তোমরা তার আরো অধিক ভালবাসা লাভ করবে। কিন্তু যে বিষয়-বস্তু দিয়ে কথা শুরু হয়েছে এখন শেষে ইহা বলা হয়েছে যে, এর ফলে তার পার্থিব জিনিষের প্রতি আকর্ষণই কম হতে থাকবে। আর কেবল ইহা করে তারা 'কষ্টের' সাথে, বাধ্য হয়ে নিজেদের হাত থেকে খুইয়ে যাওয়া জিনিষপত্রের ব্যাপারে ধৈর্য-ধারণ করে। বরং যে সব ব্যাপারে বাধ্য নয়, ঐসব জিনিষ তাদের, তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের অধীনে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অনুমতি হয়েছে তারা যেভাবে চায় ব্যবহার করতে পারে। এর পরেও তাঁর পথে উৎসাহের সাথে খরচ করে। স্বেচ্ছায় ও বাধ্য হওয়ার বিষয়-বস্তু তো রয়েছেই যা কিনা এসব আয়াতে অতীব পবিত্র মাত্রায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, যা কিছু বাধ্যবাধকতার সাথে তাদের হাত থেকে যেতে থাকে উহাও খোদারই দিকে যায়। খোদার খাতিরেই অবনত মস্তকে এবং খোদারই মনোরঞ্জনের জন্যে গ্রহণ করে নেয়। পরে আবার খোদার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্যে ঐ সব জিনিষ যা তার শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কেউ তা ছিনিয়ে নিতে পারে না। কেউ জোর করে তা নিয়ে নিতে পারে না। ঐশী-প্রেমে লিপ্ত হয়ে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তাঁর পথে খরচ করে। তখন ইহা হলো সেই সুন্দর গুণাবলী যা হজ্জব্রত পালনকারীর জন্যে আবশ্যকীয়।

একটি হজ্জ তো হলো বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক হজ্জ এবং এর ফলে বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করা হয় বা ঐ পবিত্র তীর্থস্থানগুলো প্রদক্ষিণ করা হয় যেখানে লোক

তীর্থ করার জন্যে যায়। আপনারা এর যে কোন নামই রাখুন না কেন কিন্তু হজ্জ যাত্রীদের মাথায় খোদাকে সন্তুষ্ট করার চিন্তাই প্রাধান্য লাভ করে থাকে। অতএব যে ধর্মেই যে জাতির মধ্যেই, ভূপৃষ্ঠের যে অংশেই খোদার খাতিরে কোন পবিত্র স্থানের দর্শন করা হয় উহার জন্যে জরুরী এই যে, এ সুন্দর গুণাবলী অবলম্বন করে যেন সেখানে যাওয়া হয় আর ইহা পথের ঐ সম্বল যার ফলে তোমাদের যাত্রা সার্বিকভাবে মঙ্গলজনক হবে। যদি এ পথের সম্বল না থাকে এবং বাহ্যিকভাবে ঐ পবিত্র স্থানের নামই মক্কা কেনানা রাখো বা কা'বা বলো, যা ইচ্ছা বলো বা বানারস নাম দাও অথবা মথুরা রাখো প্রকৃতপক্ষে উহা খোদার সমীপে গ্রহণের যোগ্যতা লাভ করবে না। সুতরাং খোদা মানব-মণ্ডলীকে সমবেত করার জন্যে হজ্জের ওপরে আমাদের জন্যে Exercise—এক অনুশীলন, একটি প্রচেষ্টা, একটি সংগ্রাম ও সাধনা নির্ধারণ করেছেন এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যাশা করে যে, তার হজ্জ গ্রহণীয় হোক তার ঐসব কর্ম সম্পাদন করা উচিত যা কিনা আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির খাতিরে মানব-মণ্ডলীর একত্রীকরণের লক্ষ্যে সাধিত হয়। আর এ দিক থেকে একই উম্মতে ওয়াহেদা-এর ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার কাজ আগে অগ্রসর হতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এই বিষয়-বস্তুকে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, দেখ, হজ্জ করতে যাওয়াই যথেষ্ট নয়। হজ্জ করে ফিরে আসাটাও বড় তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্চর্য কথা এই যে, মানুষ যাবার বিষয়টিকে তো গুরুত্ব দেয় কিন্তু ফিরে আসাকে কোন গুরুত্ব দেয় না যে, কী অবস্থায় ফিরে আসলো। এখানে এই কথার তাৎপর্য এই যে, যদি তোমরা এসব গুণাবলী থেকে বঞ্চিত থেকেও যাও, যদি কিছু কম্‌তি থেকেও যায় তাহলেও হজ্জ এসব দুর্বলতার কম্‌তিগুলোকে পুরো করে এবং পবিত্র স্থানগুলোর দর্শনের ফলে তোমাদের অন্তরকে প্রকৃত পরিশ্রুত পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। আর ঐসব দুর্বলতা যা কিনা ইতোপূর্বে থেকে গিয়েছিলো ঐসব দুর্বলতা-গুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তোমরা ফিরে আসো। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাতু ওয়াস সালাম এ বিষয়-বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, হজ্জ তো বড়ই উৎসাহের সাথে করতে যাও কিন্তু কখনও ইহা দেখেছো কি যে, ফিরাটা কী অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে? অন্তর পবিত্র পরিশ্রুত করে ফিরে এসেছো কি বা পূর্বের দুর্বলতাগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে এসেছ, না কি যেভাবে গেছ সেভাবেই ফিরে এসেছো?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন—

"دیکھو حج کے واسطے جانا خلوص اور محبت سے آسان ہے"

"দেখো, হজ্জে যাওয়া নিষ্ঠা ও ভালবাসার সাথে সহজসাধ্য।

অর্থাৎ প্রথম সফর ভালবাসার ফলে সাধিত হয়ে যায়। তোমরা যেভাবেই হও না কেন হামাগুড়ি দিয়েও সেখানে পৌঁছে যেতে পারো।

"কিন্তু এ অবস্থায় ফিরে আসা অনেক কঠিন কাজ।" ফিরে আসা এমন অবস্থায় খুবই কঠিন কাজ যে, ফিরে আসো তো আবার আল্লাহ্‌র ভালবাসা নিয়েই ফিরে আসো এবং মানব-মণ্ডলীর জন্যেও আল্লাহ্‌র ভালবাসার বাণী নিয়ে ফিরে আসো।

"এমন অনেক আছে যারা সেখান থেকে বিফল মনোরথ ও কঠিন হৃদয় নিয়ে ফিরে আসে।" কতক হাজী আছেন যারা তাকওয়ার বড়াই করে হজ্জে যান কিন্তু ফিরে আসেন এমন অবস্থায় যে, আগের চেয়েও বেশী অপরাধে লিপ্ত হয়ে যান। বিফল মনোরথ ও কঠিন হৃদয় নিয়ে ফিরে আসেন। "এর কারণ তো ইহাই যে, সেখানকার মূলতত্ত্ব তাদের জানা হয় না। খোসাকে দেখে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। সেখানকার কল্যাণসমূহ থেকে বঞ্চিত থেকে যায় নিজেদের অপকর্মের কারণে।" অর্থাৎ কল্যাণসমূহ থেকে বঞ্চিত হয় তাদের পাপ ও অপকর্মের কারণে। কেননা, অপকর্মসমূহ এমন মজবুত রং ধারণ করে যে, কোন পানি দ্বারা ধোলাই করা যায় না এবং পরে অভিযোগ অন্যের ওপরে আরোপিত করা হয়। "এজন্যে আবশ্যক যে, প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের সেবায় নিষ্ঠা ও ধৈর্যের সাথে কিছু সময় কাটানো যেন তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম যখন লোকদের কাদিয়ান আসার জন্যে তাকিদ করতেন তখন অবশ্যই এর উদ্দেশ্য এই থাকতো না যে, কাদিয়ানেই তাদের হজ্জ হবে। এই যে বিষয়-বস্তু যা আমি আপনাদের সামনে পড়ে শুনিয়েছি তা এসব সন্দেহ-সমূহের অবসান ঘটায় আর মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গুপ্ত জ্যোতিকে এমন শান ও মর্যাদার সাথে উজ্জ্বলতর করে দেখিয়ে দেয় যে, পূর্বে এ শান ও মর্যাদার সাথে কতকের দৃষ্টিতে উহা প্রকাশিত হয় নি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এজন্যে জামাতকে কাদিয়ানের দিকে আহ্বান করতেন যেন তাদের হজ্জ গ্রহণীয় হয়। যখন তারা হজ্জ করতে যায় আর এখান থেকে পরিশুদ্ধ হয়ে পরে তারা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে রওয়ানা দেয় যেন তারা সেখানকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কল্যাণ ও উপকার থেকে বঞ্চিত হয়ে ফিরে না আসে বরং ঐসব পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে ও কল্যাণমণ্ডিত হয়ে ফিরে আসে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন—এর কারণও এই যে, সেখানকার তত্ত্ব তাদের লাভ হয় না। তাদের তত্ত্ব কথা শেখাবার জন্যে ইহা আবশ্যক যে, কোন পবিত্র পুরুষের সাহচর্যে তারা অবস্থান করে। আর ইহা একটি আশ্চর্যের কথা যা খুবই মনোযোগ সহকারে শুনা দরকার। তিনি (আঃ) বলেন:

"تاکہ صدق پورے طور پر نورانی ہو جاوے"

"যেন সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা পরিপূর্ণভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে যায়।"

এখন আপাতঃ দৃষ্টিতে তো মানুষ ইহা বুঝে যে, সত্যবাদিতা সত্যবাদিতাই। কিন্তু মানুষের স্বভাবে ধাপে ধাপে এত পর্দা আছে যে, কতক বস্তু যাকে কিনা সে সত্য মনে করে ঐ এক পর্দার পিছনে উহা সত্য বলে প্রতীয়মান হয় কিন্তু যখন সে ঐ পর্দা উঠিয়ে পরবর্তী ধাপে পৌঁছে তখন পর্দার পিছনে উহাকে মিথ্যে বলে প্রতীয়মান হয়। আর যেভাবে যেভাবে সে উন্নতি করতে থাকে তার নিজের সত্তার গহীন গভীরের কথা-বার্তার ওপরে, অভ্যন্তরীণ অবস্থার ওপরে দৃষ্টি পড়তে থাকে আর ইহাই অন্ধকার থেকে জ্যোতির দিকে যাত্রা। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, তোমাদের মধ্যে বহু লোক এমন আছে যারা আপাতঃ দৃষ্টিতে সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠার সাথে সেখানে গিয়ে থাকবে। তাদের নিয়াতের মধ্যে তো কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় না। সত্যবাদী ও নিষ্ঠাবান বলেই মনে হবে। কিন্তু যদি পবিত্র পুরুষের সাহচর্যে জীবন কাটায়, কিছু দিন অবস্থান করে তাহলে তার সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠা জোতির্ময় হয়ে যাবে আর জ্যোতিঃ যে পর্দায়ই হোক না কেন উহা জোতিই জ্যোতিঃ। উহা পর্দাগুলোর পিছন দিককে উজ্জ্বল করে দেয়। অন্ধকার জ্যোতির ওপরে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। অতএব সত্যতারও কতিপয় অবস্থা ও কতিপয় রকম ভেদ আছে। তিনি (আঃ) বলেন—যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সত্যবাদিতা জ্যোতির্ময় না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ঐশী জ্যোতিঃ থেকে পূর্ণ কল্যাণ লাভ করতে পারো না। সুতরাং হজ্জের বিষয়-বস্তুর ওপরে আরও আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি (আঃ) বলেন—

"হজ্জের উদ্দেশ্য কেবল ইহাই নহে যে, এক ব্যক্তি ঘর থেকে বের হয় এবং সমুদ্র পাড়ি দিয়ে চলে যায় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু কথা মুখে উচ্চারণ করে একটি আনুষ্ঠানিকতা পূরণ করে চলে আসে। আসল কথা এই যে, হজ্জ উচ্চ স্তরের একটি বস্তু যা কিনা কামেল সলুক বা পরম পথের শেষ ধাপ।"

"পরম পথের শেষ ধাপ" বলতে কী বুঝায়? আমার সামনে এমন অনেক লোক বসে আছেন এবং বহু এমন লোক আছেন যারা কিনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন স্থানে বসে আমার এ বাণী শুনছেন যাদের উর্দু সম্বন্ধে অধিক জানা নেই এবং হতে পারে তরজমা কারীগণ যারা বিভিন্ন ভাষায় তরজমা করছেন তারাও এ কথা হয়ত না বুঝতে পারেন। 'সলুক' একটি বিশেষ পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছি। খোদার রাস্তায় প্রথম ধাপ থেকে দ্বিতীয় ধাপে এবং দ্বিতীয় ধাপ থেকে তৃতীয় ধাপের দিকে একটি স্থায়ী প্রবহমান যাত্রা। এজন্যে প্রত্যেক স্থানে যেখানে এ যাত্রায় মানুষ পৌঁছে যায় উহাকে 'সলুকের' ধাপ বলা হয়। প্রকৃত বিষয় এই যে, 'সলুকের' শেষ ধাপ বলতে কিছু নেই। এক অসীম পথের যাত্রা। কিন্তু এ দুনিয়াতে এমন একটি স্থান আছে যেখানে পৌঁছে মানুষ ইহা মনে করে যে, আমার যাত্রা পথের সমাপ্তি। যে পর্যন্ত আমি পৌঁছতে পেরে-

ছিলাম উহা এখানে এসে আমার লাভ হয়ে যাবে। এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে সমস্ত সলুকের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর ইহা বুঝা এজন্যে আবশ্যক যেন আপনারা মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কথার কোন ভুল অর্থ অন্তরে স্থান না দেন। 'সলুকের' পথসমূহ অসীম। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের 'সলুক' এক ধাপ পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে লাভ হয়ে যায়। আর তার 'সলুক' যদিও এক প্রবহমান যাত্রা কিন্তু পরম পর্যায়ের পর পুনরায় আরম্ভ হয়। সফরের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কখনও হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে আপনারা সফর করেন। কখনও তড়িৎ পদ-বিক্ষেপে ঐ যাত্রা চলতে রাখেন। কোথাও সফরের সকল কল্যাণরাজি থেকে আপনি উপকৃত হন। কোথাও কয়েক প্রকার দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। সফর তো করেন কিন্তু সফরের স্বাদ থেকে বঞ্চিত থেকে যান। কয়েক প্রকার সফর এমন আছে যেখানে মনোরম দৃশ্যাবলী আপনার হৃদয়কে কেড়ে নেয়, আপনার চোখকে স্নিগ্ধ করে। কিন্তু যদি আপনি অসুস্থ হন এবং কষ্টে আপতিত হন তাহলে ঐ সব মনোমুগ্ধকর সফর আপনাকে কোন স্বাদ পৌঁছাতে পারে না। বরং বঞ্চনার অনুভূতি বেড়ে যায়। তাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যেখানে 'কামাল সলুক" শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে এর এই অর্থ নয় যে, হজ্জের পরে সামনে আর কোন সফর নেই। হজ্জে গিয়ে আপনাদের সফরের পন্থা জানা হয়ে যাবে। যদি হজ্জ থেকে উপকৃত হন তাহলে খোদার পথে সফর করার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আপনাদের আয়ত্বে এসে যাবে। উদ্দেশ্য এই যে, যা কিনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলছেন—যা কিনা চূড়ান্ত পথের শেষ ধাপ অর্থাৎ সফরের শেষ ধাপ নয়, সফরের তুলনায় চূড়ান্ত শেষ ধাপ।

"বুঝা উচিত যে, মানুষের স্বীয় আত্মা থেকে একেতা বা বিচ্ছিন্নতা অবলম্বনের এই অধিকার রয়েছে যে, আল্লাহ্তা'লারই ভালবাসায় হারিয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ্-প্রেম ও ঐশী-প্রেম এমনভাবে সৃষ্টি হয়ে যায় যে, এর মোকাবেলায় না তার কোন সফরের কষ্ট হয় আর না প্রাণ ও সম্পদের পরওয়া করা হয়। প্রিয় ও নিকটবর্তীগণেরও কোন চিন্তা হয় না। যেভাবে প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের জন্যে জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় এভাবেই সে-ও কিছু করার জন্যে অসম্মতি প্রকাশ করে না।

সুতরাং 'কামাল সলুক' এর অর্থ এই যে, সফর ভালবাসার ঐ চরম অবস্থায় যেন শুরু হয় এবং প্রবহমান রাখা হয় যে পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষের সামর্থ্য আছে। প্রত্যেকে এক রকম ভালবাসা করতে পারে না। প্রত্যেক মানুষের ভালবাসা করার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন এবং এসব মন-মানসিকতার সাথেও ক্ষমতাসমূহের সম্পর্ক আছে। সুতরাং যেখানে 'কামাল সলুক'-এর উল্লেখ রয়েছে—হযরত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন—এর উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের ভিতরে ইহার একটি চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত আছে আর সে তার সফর

ঐ সীমার আগ থেকে আরম্ভ করতে পারে। ঐ সীমায় পৌঁছে স্বীয় সফরকে তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। অতএব হজ্জ থেকে তোমাদের ঐ বস্তু লাভ হয়ে যাবে যা কিনা তোমাদের 'সলুক'-কে চূড়ান্ত পরিণতি দান করবে। আর ঐ জিনিষ কী? উহা ঐশী-প্রেম। কেননা, কোন ইবাদতের শেষ উদ্দেশ্য এমনভাবে সুস্পষ্ট ও সুপ্রকাশিত ভালবাসা নয় যেভাবে হজ্জের ইবাদত স্বীয় আনুষ্ঠানিকতার সাথে আপনাদের নিকটে এ বিষয়-বস্তু প্রকাশিত করে। এ কারণেই হজ্জে মাথার চুল মুড়িয়ে ফেলার ব্যাপার সংযোজিত হয়েছে। এ কারণে হজ্জের সময়ে একটি চাদর পরিধান করে খোদার পথেই নগ্ন পায়ে দৌড়া-দোড়ি করা অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই কতকগুলো স্মৃতি সম্বলিত স্থানে আবেগাপ্লুত প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে। আর ইহা সমগ্র জগতের জাতিসমূহের মধ্যে সাধারণভাবে আদৃত হয়। হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থানসমূহের কথাই ধরুন না কেন। জগন্নাথ পুরী সম্বন্ধে বলা হয় যে, যখন জগন্নাথের রথ সেখান থেকে বহির্গত হয় তখন লক্ষ লক্ষ প্রেমিক পাগল হয়ে যায়। তখন তাদের দেহ-মনের কোন হুস থাকে না। আর শত শত লোক এমন আছে যারা রথ চলার পথে শুয়ে পড়ে যায়। নিজেদের শরীর পেতে দেয় আর ঐ রথ তাদের রক্ষা করার জন্যে থামে না। কেননা, তারা মনে করে যে, এ পথে যে শহীদ হয় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়ে গেছে। সে আল্লাহ্‌র প্রেম পেয়ে যাবে। আর এভাবে শত শত লোক সেখানে তাদের কুরবানী পেশ করে থাকে। তাই এ প্রেমের বিষয়-বস্তু প্রত্যেক হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এর সবচে' আত্মিক সম্পর্ক বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জের সাথে। প্রত্যেক মানুষই দুনিয়ার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে প্রেমিক অবস্থায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ আলায়হেস সালাম বলেন যে, কাপড়ের খেয়াল পরিত্যাগ করে এক চাদর পরিধান করে সফরের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়—না নিজের ব্যাপারে হুস থাকে, না নিকটাত্মীয়দের খেয়াল থাকে, না বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক, না দুনিয়ার জিনিস পত্রের চিন্তাই তাদের অন্তরে থাকে। সর্বপ্রকার পথ বিচ্ছিন্ন করে তারা খোদার সমীপে উপস্থিত হয়ে যায়। এরপরে তারা কী দেখে এবং কী লাভ করে? কোন্ কোন্ স্থানে তারা ভ্রমণ করে, কোন্ কোন্ মাঠে গিয়ে তারা ঘর বাঁধে, কোন্ কোন্ পাহাড়ের কিনারে যিক্‌রে ইলাহী সমূচ্চ করে। আর কোন্ কোন্ স্থানে গিয়ে তারা মাথা মূড়ায় ও কুরবানী পেশ করে। এ গোটা বিষয়-বস্তুর কিছু কিছু জ্ঞান তো আমাদের আছে কিন্তু তাদের এসব কাজের যথার্থতার রহস্য আজ পর্যন্ত উন্মোচিত হয় নি। না সম্ভবতঃ কখনও মানুষ অবহিত হতে পারে। একটি কেন্দ্রীয় কথা হলো, এই প্রেম ও বেশ কিছু খোদার প্রেমিক বান্দাদের এমন সব কার্যাবলী ছিলো, যেসব কার্যাবলীকে, তাদের আচরণকে জাগরূক রাখা হচ্ছে। যেমন ইহা ঐ বিষয়-বস্তুই যা কিনা একজন আরব কবি বর্ণনা করেন:

احی لیلی واطلالها   و رسمها ریاو اجبا لها

অর্থাৎ দেখো, দেখো, হে পথিক! যখন তুমি লায়লীর বাসস্থান ও তার টিলাগুলো দেখবে—যেখানে আমার প্রিয় লায়লী কিছু দিনের জীবন অতিবাহিত করেছিলো বা সেখানে কাটিয়েছিলো, যে পরিবেশে সে শ্বাস গ্রহণ করেছিলো—তখন তাকে আমার সালাম দিও। ঐ টিলাগুলোকে আমার সালাম দিও।

ঐ স্থান ও উহার পাহাড়ীদের আমার সালাম দিও। কেননা, আমার প্রিয়া কিছু সময় সেখানে কাটিয়েছে এবং সেখানে ঐ পরিবেশে নিজের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেছে।

সুতরাং খানা কা'বার হজ্জে যখন মানুষ যায় তখন তাদের জানা থাকে না যে, খোদার কোন্ প্রিয় ব্যক্তিবর্গ ছিলো যাঁরা কী কী প্রেমপূর্ণ কার্যক্রম সেখানে সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু উহা প্রাচীনতম স্থান যেখান থেকে আল্লাহ্‌র প্রেমে বিলীন হওয়ার অভিপ্রকাশের সূচনা হয়েছিলো এজন্যে খোদা-ই অবহিত আছেন যে, কোন্ কোন্ ধর্মের প্রবর্তক সেখানে এসেছিলেন এবং পরবর্তীকালে কী কী ধর্মের নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা জানি যে, তাদের উল্লেখ অনেক দীর্ঘ হবে। আর তাদের মধ্যে অনেক এমন ধর্ম আছে, যাদের সম্বন্ধে আমরা জানি—যাদের এমন প্রবর্তক হবে, যাদেরকে খোদা এই সৌভাগ্য দান করেছেন যে, তারা এসব স্থানে আবির্ভূত হয়েছেন এবং উচ্চস্তরের প্রেমের অভিপ্রকাশ ঘটিয়ে গেছেন। কোন স্থানে গিরদা বিছিয়ে বসে গেছেন। কোন কোন স্থানে তারা মাথা মুড়িয়েছেন। কোন স্থানে কুরবানীসমূহ পেশ করেছেন। কোন স্থানে পাগলপারা হয়ে ঘুরেছেন এবং প্রদক্ষিণের মাধ্যমে স্বীয় প্রেমের প্রকাশ দেখিয়েছেন। সুতরাং একটাই বিষয়-বস্তু অর্থাৎ প্রেমের বিষয়-বস্তু। যা কিনা সকল যুগেই ছড়িয়ে আছে। প্রাচীন কাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এই বিষয়-বস্তুই ইবাদতের ওপরে বিজয়ী, যা খোদার সম্পর্কের সকল রাস্তাতে বিজয়ী। উহাই মানব-মণ্ডলীর সম্পর্কে পরিবর্তিত হয় আর ইহাই হজ্জের প্রাণ।

অতএব যদি হজ্জের এ প্রাণকে সমুন্নত রাখতে হয় তাহলে আপনাদের সারা দুনিয়ায় এসব মৌলিক গুণাবলীকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জেহাদ করতে হবে, যার উল্লেখ কুরআন করীমে করা হয়েছে। আর হজ্জের নামে মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ঘৃণা ছড়ানো এবং বিভেদ সৃষ্টি করা হজ্জের বিষয়-বস্তুর সাথে বিদ্রোহ করা—ধর্মের প্রাণের সাথে বিদ্রোহ করা। সুতরাং আল্লাহ্-প্রেমে এমনিভাবে হারিয়ে যাও যে, ঐসব স্থান যেখানে খোদার প্রিয় বান্দারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়েছেন উহাও প্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়। ঐ পাহাড়, ঐ টিলা, মাঠ, যেখানে পাগলপারা খোদা-প্রেমিক ঘোরা ফিরা করতেন ঐসব স্থান দেখার পরে খোদার ভালবাসায় আপনাদের চোখ থেকে যেন অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়। এসব স্থানে শ্বাস-প্রশাস নিন আর আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ—(আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ্ ব্যতিরেকে এবং আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্যে—অনুবাদক)-এর গান শুনুন। ইহা সদা সমুন্নত হচ্ছে

এ প্রেম সদা সমুচ্চ হতে দেখুন আর শোনার পর আপনাদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হোক। আপনাদের সত্তার ওপরে একটি ভূমিকম্প এসে যাক আর এ সব কিছু প্রেমের ফলশ্রুতিতে। এবং পরে যেখানেই খোদা-প্রেমিক বান্দারা এভাবে নিজ নিজ স্থানে নিজ নিজ পবিত্র স্থানে হজ্জ করতে থাকে তাদের জন্যে প্রাণে ঘৃণা ও আত্মম্ভরিতার কারণে তাদেরকে হেয় চোখে দেখা আপনাদের কল্পনায়ও যেন না আসে। তারাও নিজ নিজ ধারণায়, থাক না সঠিক বা ভুল ঐ হজ্জের প্রস্তুতি করছে যা কিনা পরিশেষে আন্তর্জাতিক রূপ নেবে। এ হজ্জের প্রস্তুতির জন্যে তাদেরকে এ পদ্ধতি শিখানো হয়েছে, এ আনুষ্ঠানিকতা শিখানো হয়েছে, যা সমগ্র দুনিয়ার উম্মতকে শিখানো হয়েছে এজন্যে যে, পরিশেষে যখন 'উম্মতে ওয়াহেদা' একই মণ্ডলী বানানো হবে, মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাতে সমগ্র জগতের সকল আলামীন (জগৎ)-এর লোক একই হাতে এবং একই পতাকা তলে সমবেত হবে তখন উহা হবে হজ্জে আকবর, সর্বশ্রেষ্ঠ হজ্জ-এর দিন হবে।

আপনারা হে আহমদী জামাত! আপনাদের এ কাজের জন্যে প্রত্যাদিষ্ট বানানো হয়েছে। আপনাদের এ মহান উদ্দেশ্যের জন্যে সেবক নির্ধারিত করা হয়েছে। আর আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ ব্যাতিরেকে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে খোদাকে সাক্ষ্য রেখে বলছি যে, ঐ হজ্জ যা কিনা আগামী যুগে জামাতে আহমদীয়ার খেদমতের ফলশ্রুতিতে খোদার নিকট গৃহিত হবে এর ফলশ্রুতিতে পরিশেষে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খাতিরে সমগ্র মানব-মণ্ডলী ঐ হজ্জ পালন করবে (হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর খাতিরে এ অর্থে যে, সকল প্রেমিকদের চেয়ে সত্যিকারের প্রেমিক তিনিই)। তাঁর (সাঃ) কাছ থেকে প্রেমের ধরন শিখে তারা হজ্জ পালন করবে যা কিনা আন্তর্জাতিক হজ্জে পরিণত হবে, যা আগামী দিনগুলোতে অবশ্যই হবে। ঐ হজ্জ যা কিনা প্রকৃতপক্ষে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আদায়কৃত হজ্জের পরে হজ্জে আকবর হবে। যদ্বারা সমগ্র বিশ্বের মানুষ একীভূত হয়ে যাবে। তাদেরকে একত্র করার পদ্ধতি আপনাদের শিখাতে হবে। তাদেরকে সমবেত করার তরবীয়ত আপনাদেরকে দিতে হবে আর ঐ সেই উত্তম গুণাবলী যেগুলোই এ আয়তসমূহে বর্ণিত হয়েছে, এসব উত্তম গুণাবলী শেখার জন্যে আপনারা অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জন করুন, এসবের সেবকে পরিণত হোন। এসবের প্রচারকারীতে পরিণত হোন। এসবের আহ্বানকারীতে পরিণত হোয়ে যান। তখন দুনিয়াকে এক হাতে একস্থানে সমবেত করার ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত হবে ঐ খানা কা'বা যা কিনা প্রাচীন গৃহ ছিলো। উহা আদিও হবে আর অন্তও হবে। আর এভাবে ঐ বিষয়-বস্তু যা কিনা সূচনা কাল থেকে আরম্ভ হয়েছিলো উহা স্বীয় চূড়ান্তে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্ করুন আমাদের সেই সৌভাগ্য লাভ হোক। কাজ খুব কঠিন। আমরা খুব দুর্বল কিন্তু দোয়ার কল্যাণে নিজেদের নীতিকে সংরক্ষণ করতে করতে আপনারা ধারাবাহিকতার সাথে এ সকল প্রেমের সাথে সম্মুখে আগাতে থাকুন নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে আল্লাহতা'লা আপনাদের অবশ্যই সফলকাম করবেন।

এখন এর পরে আমি কতিপয় দোয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি। ঐ সব ঘৃনা যা মানুষকে অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, ঐসব নির্যাতন যা কিনা শক্তিশালী জাতির পক্ষ

থেকে দুর্বল ও নিঃসহায় জাতিদের ওপরে চালানো হচ্ছে, আজকের দিনে বিশেষভাবে আপনাদের দোয়ার মধ্যে তাদেরকে স্মরণ রাখুন যে, আল্লাহ্‌তা'লা যালেমদের যুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার সৌভাগ্য দেন। নির্যাতিতদের সহায়তাকারী হন এবং নির্যাতিতদের সহায়তাকারী হন এবং নির্যাতিতদের সাহায্যার্থে আরও মানব-মণ্ডলীকে খাড়া করতে থাকুন যেন তারা সহায় সম্বলহীন না থাকে। আল্লাহ্‌র সমর্থনই মানবের সমর্থনের আকারে বা ফেরেশ তাদের সমর্থনের আকারে প্রকাশিত হয়ে থাকে। আমার নিকট সবচে' প্রথম বসনিয়ার নির্যাতিতগণ। পরে কাশ্মীরের নির্যাতিতগণ পরে অন্যান্য জাতির নির্যাতিতগণ। মানব-মণ্ডলী এবং কেবল মানব-মণ্ডলীই আমার লক্ষ্য। কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমি কথা বলছি না। বর্তমান সময়ে না হিন্দুস্থান আমার সামনে না পাকিস্তান আমার সামনে। কিছু অত্যাচার হিন্দুস্থানে হচ্ছে, কিছু অত্যাচার পাকিস্তানে হচ্ছে, কিছু বসনিয়াতে হচ্ছে কিছু প্যালেষ্টাইনে হচ্ছে। কিছু দুনিয়ার অন্য জাতির মধ্যে অন্যান্য স্থানে হচ্ছে। অতএব যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে জেহাদ, যা কিনা আমার দৃষ্টিতে রয়েছে। আমার মস্তিকে রাজনীতির সামান্যতম চিন্তাও নেই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিখিল বিশ্ব জামা'ত আহমদীয়ার ইমামের কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, যুলুমের বিরুদ্ধে জেহাদের সূচনা দোয়া দ্বারা করুন। কেননা, এক দুর্বল ব্যক্তি নিজেকে নিজে এতটা যোগ্য মনে করে না যদ্বারা যুলুমকে স্বহস্তে প্রতিরোধ করতে পারে। যখন কোন মানুষ বাধ্য হয়ে অন্যের দুঃখ অনুভব করে সে আরও দুঃখী হয়ে যায়। কেননা, একেতো তার ভাই-এর দুঃখ অন্যদিকে তার অপারগতার দুঃখ, আর অপারগতার দুঃখ সবচে' অধিক বেদনাদায়ক হয়ে থাকে। বসনিয়াতে এমন যুলুম করা হয়েছে যে, পিতাকে বেঁধে রেখে তার সামনে তার কন্যার সাথে বলৎকার করা হয়েছে, তার স্ত্রীর বে-ইজ্জতি করা হয়েছে, তার সন্তান-সন্ততির মাথা কাটা হয়েছে বা দরজার সাথে ঠোকা হয়েছে, আর এসব যুলুম নির্যাতনই ঐ অপারগতার সুযোগে। আপনারা অনুমান করুন হাশর কি আরম্ভ হয়ে গেল? হাশর হয়ত তাদের অন্তরে স্থায়ী হয়ে গেছে। অতএব এক তো যুলুম হতে দেখা বহু কষ্টের কারণ। কিন্তু পুনরায় বাধ্য হয়ে সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করলে লাভ হয়। আর ধৈর্য যেহেতু আল্লাহ্‌র খাতিরে করা হয় এজন্যে ধৈর্য সর্বদা দোয়ার প্রবাহ সৃষ্টি করে। অতএব এই অর্থে আপনারা ধৈর্যের সাথে সারা দুনিয়ার জাতিবর্গের জন্যে দোয়া করুন। খোদা করুন যেন এ দুনিয়া যুলুম-নির্যাতন থেকে পবিত্র হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুনিয়া যুলুম নির্যাতন থেকে পবিত্র না হয় সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভ হয় না। আপনাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত যুলুম তাদের পিছু না ছাড়ে যুলুমের অপবিত্রতা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের হৃদয়কে ধুয়ে মুছে সাফ করে না দেয়। আপনারা যালেম ও নির্যাতনকারীদের অন্তর খোদার ভালবাসায় বদলিয়ে দিতে পারেন না। অতএব আসুন আমরা সকলে একত্রিত হয়ে খোদার নিকট মিনতি করি, তাঁর দরবারে এ অনুনয়-বিনয় করি যে, হে আল্লাহ্! এ দুনিয়াকে যুলুম নির্যাত থেকে পবিত্র করে দাও, ন্যায় বিচারে ভরে দাও, আমাদেরকে সৌভাগ্য দান করো যেন আমাদের সামান্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা তোমার নিকট গৃহিত হয় এবং তোমার নিয়তি এ কাজ করে দেখায়। খোদা করুন যেন এমনই হয়। কেননা, যতক্ষণ পর্যন্ত এমনই না হয় ইসলামের বিশ্ব-বিজয় সম্ভব নয়।

(১৯৯৪ সনের ২৪শে জুনের আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল থেকে অনূদিত)

কুরবানী সম্পর্কে কতিপয় জরুরী কথা

সংকলন : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

আল্ কুরআন বলে :

والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر - كذلك سخرنها لكم لعلكم تشكرون ٥ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالة التقوى منكم - كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ماهديكم - وبشر المحسنين ٥

অনুবাদ : আর যে রয়েছে কুরবানীর উষ্ট্রগুলি, আমরা ঐগুলিকে তোমাদের জন্য আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীর অন্তর্গত করেছি ; উহাদের মধ্যে তোমাদের জন্য অনেক মঙ্গল নিহিত আছে ; অতএব উহাদিগকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে উহাদের উপর আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ কর ; এবং যখন উহারা নিজেদের পার্শ্বে ঢলে পড়ে তখন তোমরা উহা হতে নিজেরাও আহার কর আর আহার করাও স্বল্পতুষ্ট অভাবীদিগকে এবং দরিদ্র-কাতর ব্যক্তিদিগকেও ; এইভাবে আমরা উহদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

না উহাদের মাংস আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে এবং না উহাদের রক্ত, বরং তাঁর নিকট পৌঁছে কেবল তোমাদের নিকট হতে তাকওয়া ; এইভাবে তিনি উহাদিগকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন, যেন তোমরা আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর, যেহেতু তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করেছেন ; এবং তুমি সৎকর্মশীলদিগকে সুসংবাদ দাও। (সূরা হাজ্জ : ৩৭-৩৮ আয়াত)

নবী করীম (সাঃ) বলেন :

হযরত যায়েদ বিন আরকাম রেওয়ায়াত করেছেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সাহাবাগণ (রাযিঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কুরবানী দ্বারা কী বুঝায় ? আঁ হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, ইহা তোমাদের পিতা ইব্রাহীম আলায়হেস সালামের সুন্নত। সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! ইহাতে আমাদের কী সোওয়াব হবে ? আঁ-হুযুর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, প্রতিটি লোমের বিনিময়ে একটি করে পুণ্য। সাহাবাগণ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রসূল ! পশম সম্পর্কে কি আদেশ করেন। আঁ হুযুর বললেন, এক একটি পশমের বিনিময়ে পুণ্য গণ্য হবে (মিশকাত)।

ঈদুল আযহিয়ার নামায

- কুরবানী দেওয়ার পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম খোলা মাঠে দুই রাকা'আত নামায আদায় করতেন। এই নামায সুন্নতে মুওয়াক্কেদা, যা কেবল বাজা'মাতই আদায় করতে হয়, একা পড়া যায় না (দুই ব্যক্তিতেও জামাআত হয়)। নবী করীম (সাঃ) আদেশ দিয়েছেন যেন ইহাতে পুরুষ ছাড়া মহিলারাও শামিল হয়, এমন কি যাদের উপর নামায ফরয নয় তারাও যেন খুৎবা শ্রবণ করে ও দোয়ায় শামিল হয়।
- নামাযের জন্য গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয় যথা গোসল করা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরা, আতর প্রভৃতি সুগন্ধি ব্যবহার করা, সংগতি অনুযায়ী ভাল খাবার প্রস্তুত করা। সম্ভব হলে ঈদুল আযহিয়াতে নামাযের পরেই কিছু খাওয়া দাওয়া করা উচিত, নবী করীম (সাঃ) কুরবানীর মাংস দিয়েই খাবার শুরু করতেন।
- বৃষ্টি বা অন্য কোন অনিবার্য কারণ থাকলে ময়দানের পরিবর্তে মসজিদেও নামায আদায় করা যায়। এক ঈদগাহ্‌তে একবারই নামায আদায় করা উচিত।
- সূর্য উদয় হওয়ার পর আট দশ হাত উপরে উঠলে আরম্ভ হয়ে যায় ঈদুল আযহিয়ার নামাযের সময় এবং সূর্যাস্ত পর্যন্ত বলবৎ থাকে। যদি কোন কারণে প্রথম দিনে নামায না পড়া যায় তা হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনেও পড়া যায় এবং কুরবানীও দেওয়া যায়।
- ঈদগাহ যাওয়ার ও ফিরার সময় এই তকবীর পড়া উচিত :

الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد

- নামাযের নিয়ম : প্রথম রাক'আতে তকবীরে তাহরীমা ও সানা পড়ার পর সাত বার তকবীর পাঠ করতে হবে। ইমাম উচ্চ আওয়াজে তকবীর পড়বে এবং কান পর্যন্ত হাত উঠাবে ও নামাবে এবং সাথে সাথে অনুচ্চ আওয়াজে তকবীর পড়বে। দ্বিতীয় রাকা-'আতের পূর্বে পাঁচ বার তকবীর পড়বে (মসনূন তকবীর ছাড়া)। কিরাআত উচ্চ স্বরে পড়বে। ইমাম যদি ভুলে তকবীর না পড়ে তা হলে সেজদা সাহু করতে হবে। তকবীর গণনায় ভুল করলে সেজদা সাহু করতে হবে না।
- নামাযের পর ইমাম খুৎবা পড়বে। খুৎবা শ্রবণ মুকতাদীদের জন্যে জরুরী। খুৎবার পর ইজতেমায়ী দোয়া করতে হয়। নামায পড়ার ও খুৎবা পাঠ করার জন্য একই ব্যক্তি হওয়া উচিত; হাঁ খলীফায়ে ওয়াক্ত ব্যতিক্রম করতে পারেন। (ফিকাহ আহমদীয়ার ১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

- যুল হজ্জের ৯ তারিখের ফজরের নামায হতে আরম্ভ করে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে ইমাম ও মুকতাদী সকলকেই উচ্চঃস্বরে উপরে উল্লেখিত তকবীর পাঠ করা উচিত। ঈদুল আযহিয়ার নামাযের পরও তিনবার এই তকবীর পাঠ করা উচিত। ইহা ছাড়াও ঐ দিনগুলিতে বেশী বেশী তকবীর, তসবীহ ও তাহমীদ পড়া উচিত। নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে মুমেনগণ পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ ও উঠা বসার সময় এই সব তকবীর পাঠ করতেন।

(اضحية) কুরবানী

"আয্‌হিয়া" আসলে "যাহিয়্যাতুন" (ضحية) এর বহু বচন, যার অর্থ কুরবানীর পশু। শব্দটি 'যোহা" (ضحى) হতে বহিষ্কৃত—অর্থ সূর্যের আলো যখন বিস্তৃত হয়ে পড়ে। প্রথম প্রহরকে বলা যেতে পারে যাকে চাশ্‌ত বলা হয়। চাশতের সময় নামায পড়ার পর কুরবানী দেওয়া হয় এই জন্য কুরবানীর পশুকে যাহিয়্যাতুন বলা হয়। কেননা, নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন :

من ذبح قبل صلوتنا هذا فليعد

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাদের এই নামাযের পূর্বে পশু যবাই করবে সে যেন পুনরায় কুরবানী দেয়। এই কুরবানীকে এই জন্যও "যাহিয়্যাতুন" বলা যেতে পারে যে, এই কুরবানীর মাধ্যমে ঈমানের আলো ও উন্নতি লাভ হয়। কুরবানীর পিছনে অনেক অনেক মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত আছে যার মধ্যে ইহাও যে, ইহা নির্দেশ করে যে, সে যেন পশুসুলভ আচরণকে যবাই করে এবং তদপেক্ষা মহৎ বস্তু ও উদ্দেশ্য কুরবান হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

- গরু মহিষ উট ছাগল মেষ দুম্বা কুরবানী দেয়া যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, পশু যেন সর্বাঙ্গীনভাবে নিখুঁত ও সুন্দর হয়। খোঁড়া নেংড়া শিং ভাঙ্গা কান কাটা ও জখমী না হয় যা সৌন্দর্যের লাঘব ঘটায়। সাধারণ ছোট খাট খুঁত থাকলে, যা সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ ও নষ্ট করে না, কোন আপত্তি নেই। গরু দুই বৎসর উট পাঁচ বৎসর ছাগল ও মেষ দুম্বা এক বৎসরের হলে ভাল। কিছু কম বয়স হলেও চলবে।
- উট গরু ও মহিষে বেশীর পক্ষে সাত জন শরীক হতে পারে, কম হলে কোন আপত্তি নেই। ছাগল মেষ ও দুম্বা একজনই দিতে পারে; তবে এক ব্যক্তি তার পরিবারকে শামিল রাখতে পারে। গরীবের তরফ থেকেও কুরবানী দেয়া যেতে পারে।
- যে ব্যক্তি কুরবানী দিবে সে যেন যুল হজ্জের ১লা তারিখ থেকে কুরবানীর আগ পর্যন্ত যথাসম্ভব চুল নখ প্রভৃতি কর্তন না করে।

০ কারো কারো মতে যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট তারিখগুলির মধ্যে সফর ইত্যাদি বিশেষ কারণে কুরবানী না দিতে পারে তাহলে যুল হজ্জের ঐ তারিখগুলির পরেও দিতে পারে।

০ নিজের হাতে কুরবানীর পশু যবাই করলে ভাল, তবে অন্যেরাও করতে পারে।

০ কুরবানীর মাংস কী পরিমাণ ও কীভাবে বিতরণ করবে এ সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নির্দেশ নেই, তবে গরীব মিসকীনদের মধ্যে অবশ্যই বন্টন করতে হবে। কুরবানীর মাংস অমুসলমানকেও দেয়া যেতে পারে। মাংস শুকিয়েও রাখা যায়। যুল হজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ এ তিন দিনকে আইয়্যামো তাশরীক বলা হয় অর্থাৎ মাংস শুকানোর দিনসমূহ। উত্তম পদ্ধতি ইহাই, তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীবদেরকে এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া নিজের জন্য রাখা।

০ কুরবানীর চামড়ার মূল্য কেউ নিজের জন্য ব্যবহার করবে না। এটা গরীবদের হক, হ'া, জামাতী কাজে ব্যবহৃত হতে পারে।

০ কোন আহমদীর পার্শ্বে আহমদী না থাকলে অআহমদীদের সঙ্গেও শামিল হওয়া যায় যদি তারা পসন্দ করে, নচেৎ নয়।

হযরত মসীহ মাওউদ আলায়হেস সালামকে একবার প্রশ্ন করা হলো যে, কিছু লোক সম্মিলিতভাবে একটি গরু কিনলো যাদের মধ্যে একজন আহমদীও ছিল। পরে অন্যান্যরা এই বলে আহমদীকে বাদ দিয়ে দিল যে, আহমদীকে রাখলে কুরবানী হবে না। তখন সেই ব্যক্তি লিখলো, আমি কি আমার কুরবানীর অংশের টাকা কাদিয়ান পাঠিয়ে দিতে পারি? হুযুর আকদস ইরশাদ করলেন, "সেই টাকা দিয়ে কুরবানীর পশু কিনে ওখানেই কুরবানী দাও।" আরয করা হলো, হুযুর! সেই টাকা দিয়ে গরু, ছাগল বা দুম্বা কিছুই কিনা যায় না। হুযুর আকদস ইরশাদ করলেন, "যখন তুমি নিজের উপর কুরবানী ধার্য করেছো এবং সংগতি আছে তাহলে এখন কুরবানী দেওয়া তোমার জন্য জরুরী. আর যদি সংগতি না থাকে তাহলে কুরবানী দেওয়া জরুরী নয়।" (মলফুযাত : ৯ম খণ্ড, ১৮৬ পৃঃ)

---

* কুরবানীর চামড়া জাতীয় সম্পদ। সুতরাং কুরবানীর পরে চামড়া ছাড়াবার সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন চামড়া কেটে না যায় বা অন্য কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। দক্ষ লোক দ্বারা চামড়া ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

* যবাইর পূর্বে পশুকে পানি পান করান দরকার। এতে সহজে চামড়া ছাড়ানো যায়।

* চামড়ার বিক্রিত মূল্য স্ব স্ব স্থানীয় জামাতে জমা করে দিন। জামাত নির্দিষ্ট পন্থায় তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে। প্রত্যেক জামাত মোট আদায়কৃত টাকার দশ ভাগের এক ভাগ অবশ্যই বাংলাদেশ কেন্দ্রে প্রেরণ করবে। (সাহেবুল কাহফ)

ন্যাশনাল আমীরের দফতর থেকে

(১)

প্রত্যেক জামাতকে একটি করে আহমদী পত্রিকার গ্রাহক হতে হবে। কারণ, এতে হুযূরের (আইঃ) খুতবা প্রকাশিত হয়ে থাকে। অতএব, প্রত্যেক জামা'তের জন্য আহমদীর গ্রাহক হওয়া বাধ্যতামূলক। ইনিসপেক্টর বয়তুল মাল বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন। কোন আহমদীকে বিনা পয়সায় আহমদী পত্রিকা দেয়া হবে না। যে জামাত বৎসরে মাত্র একশত টাকা হুযূরের (আইঃ) খুতবার জন্য ব্যয় করতে পারে না সেই জামা'তের অস্তিত্বের সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। পঃ বঙ্গে যারা 'আহমদী' পেতে চান তারা তাদের আমীরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আহমদী পত্রিকার জন্য আমরা লক্ষ লক্ষ টাকা প্রতি বৎসর ব্যয় করি। তাই বিনা মূল্যে আহমদীদেরকে পত্রিকা দেয়া সম্ভব নয়। পঃ বঙ্গে একটি সংখ্যা পাঠাতে ডাক খরচ লাগে পাঁচ টাকা। চব্বিশ সংখ্যার জন্য দুইশত চল্লিশ টাকা। 'আহমদী'কে সাহায্য করা সকল আহমদীর নৈতিক দায়িত্ব।

(২)

দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে আমরা সদকা করেছি, দোয়া করেছি। বিশেষ দোয়ার জন্য হুযূরকে (আইঃ) লিখেছি। হুযূর (আইঃ) উত্তরে লিখেছেন,—

লণ্ডন/১/৩/৯৬

প্রিয় সম্মানিত আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারকাতুহু।

আপনার প্রেরিত FAX ২৮/২/৯৬ তারিখে পেলাম। বাংলাদেশের অবস্থা জানতে পারলাম। জাযাকুমুল্লাহুতা'লা আহসানুল জাযা। আল্লাহ্‌ শীঘ্র এই অবস্থার পরিবর্তন শুধু তাঁর ফযল দ্বারা করুন এবং নিরাপদ পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আপনি বড়ই ভাল নোট লিখেছেন। খোদার তকদীর তো জাহের হবেই হবে। আল্লাহ্‌ যেন এমন করেন যেন তিনি তা আপনাদের পক্ষেই জাহির করেন। বাংলাদেশের উপরে দয়া করা হবে—এই ইলহাম কয়েকবার পূর্ণ হয়েছে আরো বহু বার পূর্ণ হবে। ইনশাআল্লাহ্‌। আপনারা নিজেদের দোয়া ও চেষ্টা চালিয়ে যান। আল্লাহ্‌ আপনাদের সবার হাফেয এবং নাসের হউন।

ওয়াস্‌সালাম

খাকসার

স্বাক্ষর—মির্যা তাহের আহমদ

খলীফাতুল মসীহ রাবে'।

(৩)

তবলীগ করা সকল আহমদী নর-নারীর জন্য বাধ্যতামূলক। অতএব, সকল আহমদী তবলীগে আত্মনিয়োগ করুন এবং দিনরাত নফল নামায পড়ে সম্ভব হলে নফল রোযা রেখে দোয়া করতে থাকুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে টার্গেট পূর্ণ করার সৌভাগ্য দান করেন ও আমাদেরকে সফলতা দান করেন। মুরব্বী, মোয়াল্লেমরা এদিকে বিশেষ করে লক্ষ্য দিবেন।

(৪)

দেশে নূতন নির্বাচন হবে। তাই দোয়া করুন, আল্লাহ্‌ যেন সেই সব দল বা ব্যক্তিকে জয়যুক্ত করেন যারা দেশের জন্য, জনগণের জন্য কল্যাণকর। যারা বাংলাদেশের আদর্শের বিরোধী, যারা ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে তাদের কবল থেকে যেন দেশকে এবং আমাদের সবাইকে রক্ষা করেন। আহমদী জামা'ত একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন। অতএব, কেউই যেন জামা'তের আদর্শকে বিসর্জন না দেন। আমাদের কর্মের জন্য যেন জামাতের বদনাম না হয়। সতর্কতার সঙ্গে হেকমতের সঙ্গে কাজ করুন। আমি আমন্ত্রিত হয়ে পশ্চিম বঙ্গে গিয়েছিলাম হুযুরের (আই:) আশীর্বাদ নিয়ে। হুযুর (আই:) তাঁর বাণীতে বলেন, 'He (Huzur) would like you to go ahead with your Progamme and is Praying. May Allah make it a source of guidance to the people of west Bengal. He may give you every success, Amen' (18. 3. 95.) তিন জায়গায় আমি বক্তৃতা করি (বাঁকুড়া জেলার খুমড়াঙ্গা, কলিকাতার বকুলতলা এবং ২৪ পরগণার কবিরাতে) কলিকাতার সভাটি ছিল জনসভা। বাঁকুড়ার সভায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান এবং জৈন ধর্মের প্রতিনিধি এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতবর্গ বক্তব্য রাখেন।

পঃ বঙ্গে ব্যাপকভাবে বয়াত হচ্ছে। বিগত আট মাসে সেখানে প্রায় পনর হাজার লোক (এদের মধ্যে বেশ কতিপয় মৌলবী মৌলানাও আছেন) বয়াত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। হিন্দু ধর্মের উপর লিখা আমার একটি বই হিন্দীতে ছাপা হচ্ছে। আশা করা যায় এই বইটি নেপালে খুবই কার্যকর হবে। নেপালেও বহু বয়াত হচ্ছে। এদের মধ্যে হিন্দুও আছে। বইটি অনুবাদ করেছেন জনাব নূর আহমদ এবং আংশিকভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন জনাব রমজান আলী এম, এ, এল, এল, বি। পঃ বঃ, আসাম এবং নেপালের আমীর (আমি যাকে রসিকতা করে ত্রিভুবনের আমীর বলি) আমার আহমদীয়াত গ্রহণের আট বৎসর পর বয়াত করেছেন। তিনি পরে এসে এগিয়ে গেছেন অনেক দূর। আল্লাহ্‌ তাঁকে কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু দান করুন। কবিরাবাসীকে বিশেষ করে কবি নামদার আলী (প্রেসিডেন্ট) সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই। কারণ, তার কারণেই এবার কবিরা যাওয়া হল। বেহালার সোহরায়ে আলম সাহেবকে আল্লাহ্‌তা'লা জাযায়ে খায়ের দান করুন। তার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় একটি সফল জনসভা হল।

শান্তির যুবরাজ

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন 'শান্তি রাজ।' পবিত্র কুরআন তাঁকে রহমতুল্লিল আলামীন বলেছে। মহানবীর (সাঃ) আত্মিক সন্তান ইমাম মাহদী মসীহে মাওউদ (আঃ) হলেন 'শান্তির যুবরাজ।'

হাদীসে আছে—ইয়াজাউল হারবা। অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আঃ) যুদ্ধ রহিত করবেন। বাইবেলে আছে—প্রতিশ্রুত মসীহের (আঃ) যুগেও যুদ্ধের জনরব হবে (মথি) অর্থাৎ-চারদিকে শুধু যুদ্ধ, হত্যা, হাঙ্গামা এবং নরহত্যা চলবে নির্বিবাদে। মহাভারতে আছে—সমগ্র পৃথিবীতে আগুন (যুদ্ধের) প্রজ্জলিত হবে (বনপর্ব)। কুরআন হাদীস এই যুদ্ধকে নার (অগ্নি) নামেও অভিহিত করেছে। মসীহে মাওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) এইসব যুদ্ধকে রহিত করার বাণী নিয়ে ধরায় অবতীর্ণ হবেন তিনি শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করে জগতের বুক থেকে যুদ্ধকে চিরতরে বিলুপ্ত করবেন। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেছেন—

আব ছোড় দো জেহাদ কা আয়ে দোস্তো খেয়াল
দী' কে লিয়ে হারাম হ্যা আব জঙ্গ আওর কিতাল।

তথাকথিত জেহাদ (ধর্মের নামে অস্ত্রের ব্যবহার) এখন আর চলবে না। ধর্মের জন্য হত্যা ও যুদ্ধ এখন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তিনি বলেছেন—

সইফকা কাম কলমসে দেখায়া হামনে।

তরবারি নয় কলম দিয়ে জেহাদ করার জন্য তিনি আগমন করেছেন। বলপ্রয়োগে নয়, যুক্তি, প্রমাণ, দলীল দিয়ে, প্রেম, প্রীতি ভালবাসা দিয়ে মানুষকে জয় করতে হবে। বোমা, বন্দুক, তরবারি দিয়ে নয়। অস্ত্রের মাধ্যমে কবরের নীরবতা আসতে পারে, সত্যিকারের শান্তি লাভ সম্ভব নয়।

আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মাহদী (আঃ) ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ লুধিয়ানায় বয়াতের মাধ্যমে তাঁর জামাত প্রতিষ্ঠা করেন। মার্চ মাস রোমীয় যুদ্ধ-দেবতা মার্সের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এই দেবতা, যুদ্ধ, ঝগড়া, বিবাদ এবং অশান্তির দেবতা। রোমীয়রা মার্চ মাসের ২০ তারিখ এই দেবতার পূজা করত। দিনটিকে তারা বলত 'তোবলস্ত্রানিয়াম'। যে দিনটি ছিল যুদ্ধ দেবতার জন্য উৎসর্গীকৃত সেই দিনটিতে যুদ্ধ রহিতকারী ইমাম মাহদী (আঃ) তাঁর জামাতের ভিত্তি স্থাপন করলেন।

আরবীতে 'লুদ' অর্থ ঝগড়া, বিবাদ। মাসীহে মাওউদের (আঃ) দাজ্জাল নিধনের স্থানটিকে হাদীসে 'বাবে লুদ' বলা হয়েছে। মসীহে মাওউদ (আঃ) দাজ্জলকে অস্ত্র দ্বারা

নয়, তর্কযুদ্ধে দলীল-প্রমাণ দ্বারা 'বাবে লুদে' পরাজিত করেছেন।

মসীহে মাওউদ (আঃ) তাঁর তিরোধানের একদিন পূর্বে একটি বই রচনা করেন। বইটির নাম—পয়গামে সোলাহ বা 'শান্তির বার্তা'। বইটিতে তিনি হিন্দু এবং মুসলমানকে সম্বোধন করে বলেন—"আমাদের মধ্যে শত শত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও আমরা সকলে হিন্দুই হই আর মুসলমানই হই.....মানুষ হিসাবে এক জাতি..... অতএব, আমাদের কর্তব্য বিমল চিত্ত ও শুভেচ্ছা নিয়ে পরস্পর বন্ধু হওয়া .....একে অন্যের প্রতি এরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করা যেন আমরা একে অন্যের শরীরের অংশ হয়ে যাই।"

তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর বিপদরাশি আসবে, একটি বিপদ শেষ হতে না হতেই অন্য বিপদ এসে উপস্থিত হবে। .....আর বহু লোক বিপদের মধ্যে পড়ে পাগলের মত হয়ে যাবে। অতএব, হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ! সেই দিন আসার পূর্বেই সতর্ক হোন। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে সন্ধি করে ফেলুন।" তিনি আরো বলেছেন, "প্রিয় বন্ধুগণ! সম্প্রীতির মত কাম্য আর কিছুই নাই। চলুন, আমরা এইরূপ চুক্তি পত্রের সাহায্যে মিলিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হই।"

এখানে মসীহে মাওউদ (আঃ) বলেছেন, (১) মানুষ হিসাবে হিন্দু ও মুসলমান এক জাতি (২) হিন্দু এবং মুসলমান যেন এক দেহের দু'টি অংশে পরিণত হয় (৩) বিপদ আসার পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান যেন সন্ধি করে ফেলে (৪) হিন্দু এবং মুসলমান যেন চুক্তির মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত হয়। হিন্দু এবং মুসলমানকে দু'টি জাতিতে বিভক্ত হতে বলেন নি। আফসোস হিন্দু এবং মুসলমান তাঁর এই অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করে নি। তাই আজ সমগ্র উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বলছে একটার পর একটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে। পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশের জন্মই হিন্দু মুসলমানের ঝগড়ার ফল। ঐশী পুরুষের উপদেশ গ্রহণ না করায় অখণ্ড ভারতের তিনটি অংশের জন্মই যেন আজন্ম পাপে পরিণত হয়েছে।

মহানবী (সাঃ) ছিলেন, রাসূলুল্লাহে ইলাইকুম জামিয়া—সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত। তাঁর খলীফা ইমাম মাহদীও (আঃ) অখণ্ড বিশ্বের জন্য। ভারতীয় গ্রন্থে তাঁকে কলকী জগত পতি বলা হয়েছে। অতএব, তিনি জগতকে খণ্ড বিখণ্ড করতে নয়, মানব জাতিকে বিভক্ত করতে নয়—এক করতে এসেছিলেন। তাঁর বাণীতে একতার সুর, তাঁর আহ্বানে মিলনের ধ্বনি। বক্তব্যকে রাজনৈতিক সংকীর্ণতা দিয়ে মাপা যায় না। যতদিন না এই উপমহাদেশের মানুষ তথা সমগ্র পৃথিবী ইমাম মাহদীর (আঃ) আহ্বানে 'লাব্বায়েক' না বলবে ততদিন শান্তি বলুন, পীস বলুন, মীর বলুন, হুনুজ দূরাস্ত। মসীহ মাওউদ (আঃ) ভারত বর্ষের হিন্দু মুসলমানের সন্ধির কথা বলেছেন, খৃষ্টান বৌদ্ধের কথা এখানে নাম নিয়ে বলেন নি। এর কারণ, ভারতে খৃষ্টান ও বৌদ্ধদেরকে নিয়ে কোন সমস্যা জন্ম নিবে না বা নেয় নি। সকল সমস্যার কেন্দ্র হিন্দু এবং মুসলমান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইমাম মাহদীর (আঃ) প্রতিশ্রুত পুত্র যুদ্ধ দেবতার মাস মার্চের নাম পরিবর্তন করে আমান রেখেছেন। আমান অর্থ শান্তি বা নিরাপত্তা।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

নদীর নাব্যতা ও মানুষের নৈতিক অধঃপতি

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

শুকনো মওসুমে আরিচা ঘাটে কখন কখন যানজটের সমস্যা দেখা দেয়। নদীর নাব্যতা হ্রাস ও নতুন চর পড়া-ই এর মূল কারণ। তা'ছাড়া ঘন কুয়াশার কারণেও যানজট দেখা দিতে পারে। তা হয় সমসাময়িকভাবে। সূর্যালোকে কুয়াশা কেটে গেলেই যানজটের অবসান সহজ হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে প্রকৃতির খেয়ালে যানজট হয়ে থাকে। সময় ও প্রয়োজনত ড্রেজিং অর্থাৎ মানবীয় চেষ্টায় এসব সমস্যার সমাধান করা যায়।

গত কয়েক মাসে যত ঘন ঘন এবং ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী যানজটে আরিচা ঘাট আক্রান্ত হয়ে জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে ইতোপুর্বে তা আর কখনও দেখা যায়নি। ঘাট পারাপারে অত্যাবশ্যকীয় মালপত্র বহন করাই দুরূহ হয়নি মানুষের কষ্টেরও পরিসীমা ছিল না। জট খোলার জন্য বেশ কয়েকবার মন্ত্রী মহোদয়কেও আরিচাঘাটে তশরীফ নিতে হয়েছে।

২৫শে ডিসেম্বর/৯৬ তারিখে দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে জনাব কাওসার রহমান যানজট সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি তুলে ধরেন। তার প্রতিবেদনের তিন কলাম ব্যাপী হেডলাইন ছিল : 'আরিচাঘাটে যানজটের প্রধান কারণ তেল চুরি'। প্রতিবেদনের একস্থানে বলা হয় আরিচায় যানজট সৃষ্টির মূল কারণ তেল চুরি। এই তেল চুরিকে কেন্দ্র করে একটি দুর্নীতিবাজ চক্র বারবার আরিচায় যানজটের সৃষ্টি করে যাত্রীদের দুর্ভোগে ফেলছে। গত নভেম্বর থেকে তেল চুরির বিষয়ে কর্তৃপক্ষ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায় এই চক্রটি ইচ্ছাকৃতভাবে চরে ফেরি আটকে দিয়ে যানজট সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। যাত্রীদের চরে ঘন্টার পর ঘন্টা জিম্মি করে দুর্নীতির সুযোগ দিতে কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। রবিবারও 'শাহ আলী' ফেরিটি যানবাহনসহ পাঁচ শ' যাত্রী নিয়ে পাঁচ ঘন্টা চরে আটকা পড়েছিল। এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, নদীর নাব্যতা হ্রাস, চর জাগা বা কুয়াশা এসবের চেয়েও মারাত্মক হলো মানব চরিত্রের নৈতিকতা হ্রাস। উল্লেখ্য যে, জীবনে ভাল বা মন্দ পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা মানুষকে দেয়া হয়েছে। এজন্যই তার বিচার হবে। আগেই মানুষের বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে। তার বুদ্ধি যখন দুর্বুদ্ধির রূপ নেয়, ষড়যন্ত্র ও কূট-কৌশলে নিয়োজিত হয় তখন তা সমাজের অযথা দুর্ভোগ দুর্গতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, নৈতিক অধঃপতনে আক্রান্ত লোকেরা নিজেদের হীন স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে পারে না। দেশ, সমাজ, মানবতা তাদের কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে না। এ অবস্থায় কল্যাণময় পরিবর্তনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নবী-রসূলের শুভাগমন হয়ে থাকে। তাঁরা 'পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া' দ্বারা মানুষকে কুপথ ছাড়ার ও সুপথ ধরার কৌশল শিখায়। এ ব্যাপারেও আল্লাহ্‌র এই মহাসুন্নতের কোনই ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এযুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ ইসলামের পুনর্জাগরণ ও পুনর্বাসনের জন্য ইমাম মাহদীরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁকে গ্রহণের মাঝেই রয়েছে আমাদের

(অবশিষ্টাংশ ৫০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

হে বান্দা!

আহমদ সেলবর্ষী

হে বান্দা! তুমি মানুষ হও।
অমানুষ বা অতি মানুষ নয়,
তুমি প্রকৃত মানুষ হও।
আকাশের মত তুমি উদার হও,
বাতাসের মত হও বেগবান।
আগুনের মত জ্বালিয়ে দাও
সব অন্যায়, অবিচার, ব্যবধান।
পানির মত শীতলতা নিয়ে
তুমি শান্তি বিলিয়ে দাও,
তোমার হৃদয়কে প্রশস্ত করে নাও।
আল্লাহ্‌র আরশ হোক তোমার হৃদয়,
আল্লাহ্‌র আসনের নিচে শুধু পুণ্যবান নয়
পাপীরাও পায় আশ্রয়।
পাপীদের জন্য কেঁদে কেঁদে তুমি
জাহান্নামের আগুন নিভিয়ে দাও।
তুমি মানুষের ক্ষুদ্র জীবনে
ত্রুটী অনুসন্ধান কর না।
তুমি মহামানবদের জীবনের পাঠ নাও।
এক কথায় তুমি—
আল্লাহ্‌র রঙ্গে রঙ্গীন হও,
তুমি শুধু তাঁরই বান্দা হও।

(৪৯ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

নৈতিকতাবোধ ফিরে পাওয়ার উপায়। তিনি কুরআনের আল্লাহ্‌ ও রসুলকে সঠিকভাবে চিনেছেন জেনেছেন।

এই শুভ-সংবাদ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার জন্য আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে অনেক-গুণ বাড়াতে হবে। একথা যেন, আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকে ও আচার-আচরণে স্বচ্ছভাবে কুরআনের মহান শিক্ষা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। উপলব্ধির বিষয় হলো, মানুষ সৎ না হলে আরিচা কেন কোন ঘাট হতেই দুর্গতি দুর্ভোগ দূর হবে না বরং আরো জেঁকে বসবে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : পাঠক-পাঠিকারা চলতি দুনিয়ার হালচাল সম্পর্কে চিঠি দ্বারা তাদের মতামত জানালে লেখক তার লেখার মান উন্নয়নে কাজে লাগাতে পারবে ও তাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।]

আহমদীয়া তবলীগী পকেট বুক

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর সাহেব, ফাযেল, প্রাক্তন নাযের ইসলাহ ও ইরশাদ
ভাষান্তর : মুহাম্মদ মুতিউর রহমান

(একাদশ কিস্তি)

মসীহ্ (আঃ)-এর অবতরণ ও মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব :

নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসসমূহে ইবনে মরিয়মের অবতরণ সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখিত আছে আমাদের নিকট এর অর্থ এই যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইমাম মাহদী (আঃ) শেষ যুগে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে দুনিয়ার সংশোধনের জন্যে আবির্ভূত হবেন। মোট কথা 'ইবনে মরিয়ম' শব্দটি হাদীসসমূহে এ কথার জন্যে রূপকভাবে ব্যবহৃত একটি শব্দ যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মধ্য থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় এক ব্যক্তি হবেন যিনি তার গুণে গুণান্বিত ও সদৃশ হয়ে আবির্ভূত হবেন। কোন শব্দের রূপক ব্যবহারের যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে সম্বন্ধসমূহের উপস্থিতিতে ঐ শব্দকে উপমিত মনে করা হবে আর যদি কোন সম্বন্ধ মজুদ না থাকে তাহলে উহার ব্যবহার বাস্তবিক অর্থে হবে রূপক অর্থে হবে না।

নিম্নে মসীহ্ (আঃ)-এর অবতরণ সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস পেশ করা হলো :

১। বুখারী শরীফ—হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

كيف انتم اذا نزل ابن مريم منكم و امامكم منكم -

(بخاری جلد ۱ ص ۴۹۰ باب نزول عیسی مسند احمد جلد ۲ ص ۲۷۲ مطبوعہ مصر)

বঙ্গানুবাদ : হে মুসলমানগণ! তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মাঝে ইবনে মারয়ম অবতীর্ণ হবেন এমতাবস্থায় যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন। (বুখারী : ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৫ ঈসার অবতরণ অধ্যায়, মুসনাদ আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৩৬, মিশরে মুদ্রিত)

২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে :

ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يضع الحرب - (بخاری جلد اول باب نزول عیسی مطبوعہ مطبع مجتبائی)

বঙ্গানুবাদ : শীঘ্রই তোমাদের মধ্যে ইবনে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী রূপে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন, শূকর বধ করবেন এবং যুদ্ধকে রহিত করবেন। (বুখারী : ১ম খণ্ড, ঈসার অবতরণ অধ্যায়, মুদ্রণে মুজতাবায়ী ছাপাখানা)

৩। সহী মুসলিম : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم فامكم منكم (صحيح مسلم مع شرح النووى
جلد اول ص ٨٧)

অন্য বর্ণনায় যা এ বর্ণনার পরে লিখিত আছে, সে হাদীসের বাক্য এ শব্দগুলো দ্বারা রচিত হয়েছে :

قال ابن ابى ذئب تدرى ما امكم منكم قلت تخبرنى قال فامكم بكتاب ربكم عزوجل
و سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم -

বঙ্গানুবাদ : ইবনে আবী যায়েব (রাঃ) বলেন, তোমাদের জানা আছে কি যে, 'ফাআম্মাকুম মিনকুম' এর অর্থ কি? আমি বল্লাম, আপনিই বলুন। তখন তিনি বল্লেন, মসীহ্ (আঃ) তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কিতাব ও তোমাদের নবী (সাঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী ইমামতী করবেন। (সহী মুসলিম, শরাহ্ নববী, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৮৭)

৪। আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন :

ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن
الجزية و ليتركن القلاص فلا يسعى عليها - (صحيح مسلم جلد اول مع شرح النووى
ص ٨٧ مسند احمد جلد ٢ ص ٣٩٤)

বঙ্গানুবাদ : অবশ্যই ঈসা ইবনে মরিয়ম ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী হয়ে অবতীর্ণ হবেন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করবেন এবং অবশ্যই শূকর বধ করবেন এবং জিযিয়া করকে অবশ্যই মওকুফ করে দেবেন এবং উটনীকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা হবে। সুতরাং উহা আর বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হবে না (মোট কথা নব নব যান-বাহনাদি আবিষ্কৃত হবে। এজন্যে দ্রুত গমনের জন্যে উটনীকে ব্যবহার করা হবে না)

(সহী মুসলিম, প্রথম খণ্ড, শরাহ্ নববী পৃষ্ঠা-৮৭)

সহী মুসলিমে নওয়াস বিন সাম'আন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আগমনকারী মসীহ্ এর জন্যে 'ঈসা নবী উল্লাহ্' শব্দগুলো চার বার ব্যবহৃত হয়েছে 'ফাইয়াহ্‌বেতু নবীউল্লাহে ঈসা'।

৫। মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে :

يوشك من عاش منكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا حكما عدلا فيكسر
الصليب و يقتل الخنزير......الخ (جلد ٢ ص ٤١١ مطبوعه مصر)

বঙ্গানুবাদ : নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসা-কারী মাহদী রূপে। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করবেন এবং শূকর (বদখান ও নির্লজ্জ

ব্যক্তিদিগকে রূহানীভাবে) নিধন করবেন ও ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করবেন।" (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খণ্ড, ৪১১ পৃষ্ঠা মিশরে মুদ্রিত)

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ একই ব্যক্তি হবেন এবং তাঁর বিভিন্ন কার্যানুযায়ী তাঁর দু'টো নাম হবে।

৬। মুহাম্মদ বিন খালেদ আল্ জুন্দী থেকে বর্ণিত আছে:

لا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا ادبارا ولا الناس الا شحا ولا المهدى الا عيسى بن مريم (ابن ماجة)

বঙ্গানুবাদ: আচার ব্যবহারে কর্কশতা, দুনিয়াতে দুর্ভোগ ও মানুষের মধ্যে কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে এবং ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতিরেকে কোন মাহদী নেই।

(ইবনে মাজাহ্)

এ হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ দুই ব্যক্তি নন।

কিন্তু এ দু'টো হাদীস থাকা সত্ত্বেও 'ইবনে মরিয়ম' ও 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' শব্দগুলো দ্বারা কতক আলেম এ ভ্রান্তিতে নিপতিত হন যে, হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় মাটির দেহ নিয়ে আকাশে জীবন্ত মজুদ রয়েছেন এবং শেষ যুগে অবতীর্ণ হবেন। আর এ বিভ্রান্তির কারণে তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে 'মুতাওয়াফ্‌ফীকা' ও 'তাওয়াফ্‌ফায়তানী' শব্দগুলোর মধ্যে 'ওফাত' শব্দ অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা করেছেন এবং অর্থ করেছেন আত্মা ও দেহ সমেত জীবিতাবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নেয়া। অথচ এ আয়াত মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে সুস্পষ্ট ঐশী ঘোষণা। ইহা স্বীকৃত যে, তফসীরকারকগণ এসব হাদীসের ভিত্তিতে নিজেরাই ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন:

انما احتاج المفسرون الى تاويل الوفاة بما ذكر لان الصحيح ان الله رفعه الى السماء من غير وفاة (فتح البيان جلد ۲ ص ۴۹)

বঙ্গানুবাদ: তফসীরকারগণ [মসীহ্ (আঃ)-এর প্রসঙ্গে] 'ওফাত' এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করার জন্যে বাধ্য ছিলেন, যেভাবে ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কেমনা, সঠিক কথা ইহাই (প্রচলিত ধারণা মতে—অনুবাদক) যে, আল্লাহ্‌তা'লা ঈসা (আঃ)-কে মৃত্যু ব্যতিরেকে আকাশে উঠিয়ে নিয়েছেন। (ফাতহুল বায়ান, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯)

অন্য আর একটি দল আছে যারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা করেন নি এবং ইহাকে আসল অর্থে রেখে এ দলটি মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর স্বীকারকারী ছিলেন। তারা কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যার পরিবর্তে নবী করীম (সাঃ)-এর অবতরণের বিষয়টি থেকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর একজন অনুরূপ ব্যক্তির আবির্ভাবকে স্বীকার করেছেন। অথবা ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের অর্থ ইমাম মাহদী হিসেবে মসীহ্ (আঃ)-এর প্রতিবিম্বাকারে

আবির্ভাবকে স্বীকার করেছেন। যেমন, ইমাম সিরাজ উদ্দীন ইব্‌নে ওয়ার্দী মসীহ্‌ (আঃ)-এর মূলতঃ অবতরণের সত্যায়ন করার পরে অন্য আর এক দলের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্বন্ধে এরূপ লিখেছেন :

قالت فرقة مى نزول عيسى خروج رجل يشبه عيسى فى الفضل والشرف كما يقال للرجل الخير ملك و للشرير شيطان تشبيها بهما و لا يراد الا عيان" -

(خريدة العجائب و فريدة الرغائب ص ٢١٤ مطبوعة التقويم العلمى مصر)

বঙ্গানুবাদ ঃ এক দল ঈসা (আঃ)-এর অবতরণের বিষয়টি দ্বারা এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব মনে করেছেন যিনি মান ও মর্যাদায় ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ হবেন। যেভাবে সদৃশ দেখাবার জন্যে পুণ্যবান ব্যক্তিকে ফিরিশ্‌তা এবং দুষ্টকে শয়তান বলা হয়। কিন্তু এর অর্থ ফিরিশ্‌তা বা শয়তানের ব্যক্তি সত্তা হয় না। (খুরাইদাতুল 'আজায়েব ওয়া ফারিদাতুর রাগায়েব পৃঃ ২৪১, মুদ্রণে আত্তাকরীমুল ইলমী, মিশর)

ইহা জানা আবশ্যক যে, জামাতে আহমদীয়াও ঐ একই ধর্ম-বিশ্বাস পোষণ করে। মুহাম্মদ আকরাম সাহেব সাবেরী 'ইকতেবাসুল আনওয়ার' নামক পুস্তকে লিখেন ঃ

"بعضے برا انند كه روح عيسى درمهدى بروز كند و نزول عبارت از همين بروز است مطابق اين حديث لا مهدى الا عيسى بن مريم (ص ٥٢)

বঙ্গানুবাদ ঃ কতক লোকের এই ধর্মীয় বিশ্বাস যে, ঈসা (আঃ)-এর আধ্যাত্মিকতা মাহদী (আঃ)-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত (প্রকাশিত) হবে এবং হাদীসের শব্দ 'নুযুল' (অবতরণে)-এর অর্থ ঐ হাদীস অনুযায়ী—সেই কোন মাহদী ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম ব্যতিরেকে—প্রতিবিম্বই হবে। (পৃষ্ঠা ৫২)

আল্লামা শায়াবযীও শরাহ্‌ দেওয়ান-এর মধ্যে লেখেন :

"روح عيسى عليه السلام در مهدى عليه السلام بروز كند و نزول عيسى اين بروز است" - (غاية المقصود ص ٢١)

[বঙ্গানুবাদ ঃ হযরত ঈসা আলায়হে সালামের আত্মা মাহদী আলায়হেস সালামের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হলো আর 'নুযুলে ঈসা' এ প্রতিবিম্বনকে বলে। (গায়তুল মকসুদ, পৃষ্ঠা ২১) —অনুবাদক]

হযরত মুহীউদ্দীন ইব্‌নে আরাবী (রহঃ) বলেছেন ঃ

"وجب نزوله فى اخر الزمان بتعلقه ببدن اخر" - (تفسير مراتس البيان جلد ١ ص ٢٦٢)

অর্থাৎ ঈসা (আঃ)-এর শেষ যুগের অবতরণ অপর একটি দেহে (সত্তায়) হওয়াই আবশ্যকীয়। (তফসীর 'উরায়েসুল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২)

বুরূয বা প্রতিবিম্বিত হওয়ার তাৎপর্য :

(১) শেখ মোহাম্মদ আকরাম সাবেরী ঐ স্থানেই প্রতিবিম্বিত হওয়ার অর্থ সম্বন্ধে বর্ণনা করেন :

روحانیت کمل کہ بر ارباب ریاضت چناں تصرف می فرماید کہ فاعل افعال شاں می گردد، ایں مرتبہ را صوفیاء بروز می گویند" – (اقتباس الانوار ص ۵۲)

বঙ্গানুবাদ : সিদ্ধ পুরুষগণের আধ্যাত্মিকতা সাধকগণের ওপরে এরূপভাবে প্রতিফলিত হয় যে, ঐ আধ্যাত্মিকতা তাদের কর্মের কর্তায় পরিণত হয়ে যায়। এ মর্যাদাকে সুফী সাধকগণ বরূয বা প্রতিবিম্ব রূপে আখ্যায়িত করেন। (ইকতেবাসুল আনওয়ার পৃষ্ঠা-৫২)

(২) চাঁচড়া শরীফের খাজা গোলাম ফরীদ সাহেব বলেছেন :

والبروز ان یفیض روح من ارواح الکمل علی کامل کما یفیض علیہ التجلیات وھو یصیر مظہرہ و یقول انا ھو – (اشارات فریدی حصہ دوم ص ۱۱۰)

বঙ্গানুবাদ : বরূয বা প্রতিবিম্ব বলতে বুঝায় যে, সিদ্ধ পুরুষগণের আত্মা থেকে কোন আত্মা কোন সিদ্ধ পুরুষের ওপরে প্রতিফলিত হয়ে ফয়েয বা কল্যাণ বর্ষণ করে যেভাবে ইঁহার ওপরে জ্যোতির্বিকাশ ঘটলে ইহা উঁহার মযহার বা প্রকাশকে পরিণত হয়ে যায় এবং বলে যে, আমি উঁহাই। (ইশারাতে ফরীদী : ২য় অংশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

(৩) হযরত শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহঃ) স্বয়ং নিজেকে আঁ হযরত (সাঃ)-এর বরূয নির্ধারণ করে বলেন :

ھذا وجود جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا وجود عبد القادر (گلدستہ کرامات مؤلفہ مفتی غلام سرور صاحب مطبوعہ افتخار دہلوی ص ۸)

বঙ্গানুবাদ : আমার সত্তা আমার দাদা মুহাম্মদ—(সাঃ)-এর সত্তা আব্দুল কাদেরের সত্তা নয়। (গুলদাস্তা কেরামাত, সংকলক : মুফতী গোলাম সারওয়ার সাহেব, মুদ্রাকর ইফতে-খার দেহেলবী, পৃষ্ঠা-৮)

এ উক্তিতে হযরত শেখ আবদুল কাদের আলায়হের রহমত স্বীয় 'ফানা ফির রাসূল' [অর্থাৎ রসূলের (সাঃ) মধ্যে বিলীন] হওয়ার মকাম বা অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন। মোট কথা 'ফানা ফির রাসূল'-এর মকাম লাভ করার কারণে তাঁর সত্তা প্রতিবিম্বাকারে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সত্তায় পরিণত হয়ে গিয়েছে, মূলতঃ নয়।

যেহেতু আঁ হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণিত, এজন্যে এই বিষয়টি রূপক অর্থে বর্তমান অবস্থার সাথে এমনভাবে সম্বন্ধযুক্ত যে, হযরত শেখ আবদুল কাদের আলায়হের রহমত স্বয়ং নিজেকে 'ফানা ফির রাসূল' হওয়ার কারণে বরূযীভাবে রূপক অর্থে মুহাম্মদ (সাঃ) নির্ধারণ করেছেন।

মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর বুরূযী অবতরণ :

এভাবে যেহেতু হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু কুরআন শরীফের সংশ্লিষ্ট আয়াত দ্বারা এবং হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তাই ইবনে মরিয়মের অবতরণের তাৎপর্য ইহাই হতে পারে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইমাম মাহদী ঈসা আলায়হেস সালামের বরূষ বা প্রতিবিম্ব হবেন এবং তাঁকে হাদীসের মধ্যে ঈসা (আঃ)-এর সদৃশ ও অনুরূপ হওয়ার কারণে ইবনে মরিয়ম ও ঈসা ইবনে মরিয়ম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জন্যে ইবনে মরিয়ম নামটি রূপক অর্থে প্রদান করা হয়েছে :

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ও ইবনে মাজাহ্-এর দু'টো হাদীসে এ কথার সমর্থন রয়েছে যে, ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইমাম মাহদীরই গুণবাচক নাম যা কিনা রূপকভাবে প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) লিখেছেন :

اطلاق اسم الشيئ على على مايشابهه فى اكثر خواصه و صفاته جائزحسن -

(تفسير كبير جلد ٢ ص ٦٨٩)

অর্থাৎ কোন জিনিষের নাম অন্য কোন জিনিষের ওপরে, যা কিনা উহার অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, প্রয়োগ করা সিদ্ধ এবং প্রশংসার্হ।

(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৮৯)

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কুরআন মজীদে বর্ণিত আছে :

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم ايات الله مبينت ليخرج الذين امنوا و عملوا الصلحت من الظلمت الى النور -

[বঙ্গানুবাদ : আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, এক স্মারক—একজন রসূল যে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যেন সে—যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে—তাদিগকে অন্ধকার রাশি থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসে।—সূরা তালাক ১১-১২ আয়াত—অনুবাদক]।

এই আয়াতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অবতীর্ণ হওয়ার সংবাদ প্রদান করা হয়েছে যদিও তিনি (সাঃ) স্বীয় মায়ের গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে আবির্ভূত করলেন এ জন্যে প্রতাপ ও সম্মান প্রদর্শনার্থে তাঁর (সাঃ) জন্যে 'নুযূল' (অবতীর্ণ) শব্দ ব্যবহার করেছেন। এভাবেই নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসে মসীলে ঈসার (ঈসা-আঃ-এর সদৃশ) জন্যে নুযূল শব্দ সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেভাবে ইমাম মাহদী হওয়ার কারণে উম্মতের মধ্যে তিনি তাঁর মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী ছিলেন।

দ্বিতীয় কথা, এ আয়াত থেকে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে কুরআন করীমে উপস্থিত হওয়ার কারণে রূপকভাবে 'যিকরুন' বা স্মারক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লামা মুহাম্মদ ইসমাঈল হাক্কী স্বীয় তফসীর রূহুল বায়ানে লেখেন:

"কুরআন মজীদের এ আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে 'যিকর' বলে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা (ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক)-এর কারণে সাদৃশ্য প্রদান করা হয়েছে। 'ফা উতলিকা 'আলায়হে ইসমুল মুশাব্বাহি বিহী ইসতি'আরাতান তাসরীহিয়্যাতান—(অতঃপর তার ওপরে আরোপিত করা হয়েছে সাদৃশ্যপূর্ণ নাম—রূপকভাবেও বিশদভাবেও—অনুবাদক)। এভাবে সাদৃশ্যকে যা কিনা আঁ-হযরত (সাঃ) স্বয়ং ছিলেন, এ সাদৃশ্যপূর্ণ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে রূপকভাবেও এবং বিষদভাবেও"।

এথেকে ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আঁ-হযরত (সাঃ) প্রকৃত অর্থে 'যিকর' নন। রূপকভাবে এবং অপ্রকৃতভাবে তাঁকে 'যিকর' নির্ধারণ করা হয়েছে। সেভাবেই ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈসা ইবনে মরিয়ম শব্দ উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মসীহ মাওউদ-এর জন্যে রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রকৃত অর্থে মসীহ্ ইবনে মরিয়মের আকাশ থেকে নেমে আসার অর্থে নয়।

কুনিয়াত (ডাক নাম)ও রূপক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। আল্লামা যমখশরী 'হাযাল্লাযী রুযিকনা মিন কাবলু'—আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

"এই আয়াতের অর্থ এই যে, কেয়ামতে যে রিয্‌ক মিলবে ইহা ঐ রিয্‌কের অনুরূপ যা আমাদেরকে ইতোপূর্বে প্রদান করা হয়েছিলো (প্রকৃতপক্ষে হুবহু ঐ রিয্‌ক নয়-উদ্ধৃতিকার)। আর উহার দলীল (অর্থাৎ সম্পর্ক) ওয়া উতূ বিহী মুতাশাবিহান (অর্থাৎ দুনিয়ার রিয্‌কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রিয্‌ক দেয়া হবে-উদ্ধৃতিকার)"

উহার দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লামা যমখশরী লিখেছেন:

هذا كقولك ابو يوسف ابو حنيفة تريد انه لاستحكام الشبه كأن ذاته ذاته" -

(تفسیرالكشاف جلد ١ ص ٢٠٢)

বঙ্গানুবাদ: কেয়ামতের রিয্‌ককে দুনিয়ার রিয্‌ক হিসেবে নির্ধারণ করা তোমার ঐ কথার অনুরূপ যে, আবূ ইউসুফই আবূ হানীফা। আর এর অর্থ এই হয় যে, উভয়ের মাঝে গভীরতম সাদৃশ্য থাকার কারণে যেন আবূ ইউসুফের সত্তাকে আবূ হানীফার সত্তা হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এজন্যে আবূ ইউসুফ বলার পরিবর্তে আবূ হানীফা বলে আবূ ইউসুফকে বুঝান হয়েছে।

আল্লামা উবায়েদুল্লাহ্ বিন মাস'উদ হানফী স্বীয় পুস্তক 'আত্তাওযীহ্'-এর মধ্যে লিখেছেন :

كاستعارة اسم ابى حنيفة رحمه الله تعالى لرجل عالم فقيه متق -

(التوضيح ص ١٨٤)

অর্থাৎ, একজন খোদা-ভীরু আলেম ফেকাহ্‌বিদকে রূপকভাবে আবু হানীফা বলা হয়ে থাকে। (আত্তাওযীহ্ পৃষ্ঠা-১৮৪)

এভাবে সহী বুখারীতে উল্লেখিত আছে যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস-এর দরবারে আবু সুফিয়ান আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পক্ষে নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছিলেন :

لقد امر ابن ابى كبشة يخافه ملك بنى اصفر (بخارى)

যে, ইবনে আবী কাবশাহ্-এর কাজ তো এমনভাবে চলছে যে, রোমের বাদশাহ্ও তাকে ভয় পাচ্ছে।

এ বাক্যের মধ্যে তৌহীদের ঘোষণায় ইবনে আবী কাবশাহ্-এর সাদৃশ্য রাখার কারণে আবু সুফিয়ান রূপকভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে ইবনে আবী কাবশাহ্ আখ্যায়িত করেছেন অথচ তিনি ছিলেন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ্।

ইয়াহিয়া (আঃ)-ছিলেন ইলিয়াস (আঃ)-এর বরূয :

বাইবেলে বর্ণিত এলিয় (ইলিয়াস-আঃ)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীকে হযরত ঈসা (আঃ) ইউহান্না (ইয়াহিয়া-আঃ)-এর সত্তায় পূর্ণ হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। যার অর্থ এই যে, তিনি ইয়াহিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ)-এর প্রতিবিম্ব নির্ধারণ করেছেন।

এর বিস্তারিত বিবরণ 'মালাকি' পুস্তকের ৪ অধ্যায়ের ৫নং শ্লোকে লেখা আছে :

"দেখ, সদা প্রভুর সেই মহৎ ও ভয়ঙ্কর দিন আসিবার পূর্বে আমি তোমাদের নিকটে এলিয় ভাববাদীকে প্রেরণ করিব।

এথেকে ইহুদীগণ ইহা মনে করতো যে, সত্য মসীহের পূর্বে আকাশ থেকে এলিয় নবীর আসা জরুরী। রাজাবলী মোতাবেক তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ছিলো যে, 'অগ্নিময় এক রথ ও অগ্নিময় অশ্বগণ আসিয়া তাহাদিগকে পৃথক করিল এলিয় ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠিয়া গেলেন। (২ রাজাবলী : ২ অধ্যায়, ১২ শ্লোক)।

মসীহ (আঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিলো যে, যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে এলিয় কোথায়? মসীহ্ (আঃ) ইউহান্নাকে এলিয় নির্ধারিত করতে গিয়ে জবাব দিয়েছিলেন :

"কেননা, সমস্ত ভাববাদী ও ব্যবস্থা যোহন পর্যন্ত ভাববাণী বলিয়াছে। আর তোমরা যদি গ্রহণ করিতে সম্মত হও, তবে জানিবে, যে এলিয়ের আগমন হবে, তিনি এই ব্যক্তি যাহার শুনিতে কান থাকে সে শুনুক' (মথি-১১ অধ্যায় : ১৪-১৫ শ্লোক)

নুযূলের তাৎপর্য :

আমরা বলে এসেছি যে, 'নুযূল' শব্দ অপ্রকৃত অর্থে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন করীম থেকে ইহা জানা যায় যে, প্রত্যেক বস্তু খোদাতা'লার নিকট থেকেই অবতীর্ণ হয়। এর অর্থ এই যে, ঐশী অর্থাৎ খোদার মীমাংসার ফলেই সকল বস্তুর প্রকাশ ঘটে থাকে। নিম্নোক্ত আয়াতগুলা এর ওপরে সাক্ষ্য প্রদান করছে :

১। وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم (الحجر : ২২)

বঙ্গানুবাদ : আর এমন কোন বস্তু নেই যার (অফুরন্ত) ভাণ্ডারসমূহ আমাদের কাছে নেই এবং আমরা কেবল নিরূপিত পরিমাণ ব্যতিরেকে উহা অবতীর্ণ করি না। (সূরা হিজর : ২২ আয়াত)

এই আয়াতে প্রত্যেক বস্তুর আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

২। ينزل من السماء رزقا - (المؤمن : ১৪)

বঙ্গানুবাদ : তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে রিয্‌ক নাযেল করেন।

(সূরা মোমেন : ১৪ আয়াত)

এ আয়াতে আকাশ থেকে রিয্‌ক অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ বাহ্যিকভাবে রিয্‌ক জমি থেকে উৎপন্ন হয়।

৩। ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء - (الشورى : ২৮)

বঙ্গানুবাদ : আর আল্লাহ্‌ যদি নিজ বান্দাগণের জন্যে রিয্‌ককে অধিক পরিমাণে সম্প্রসারিত করে দিতেন, তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীতে বিদ্রোহ করতো, কিন্তু তিনি যা কিছু চান পরিমাণ অনুযায়ী নাযেল করেন। (সূরা শূরা : ২৮ আয়াত)

এ আয়াতেও রিয্‌ক নাযেল বা অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৪। وانزل لكم من الانعام ثمانية ازواج - (الزمر : ৭)

বঙ্গানুবাদ : এবং তিনি তোমাদের জন্যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুসমূহের মধ্য থেকে আট জোড়া নাযেল করেছেন। (সূরা যুমার : ৭ আয়াত)

এ আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুর নাযেল হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৫। يبنى ادم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا (الاعراف : ২৭)

বঙ্গানুবাদ : হে আদম সন্তানগণ! আমরা তোমাদের জন্যে এমন পোশাক নাযেল করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থানসমূহকে আবৃত করে এবং (যা) সৌন্দর্য স্বরূপ.....।

(সূরা আ'রাফ : ২৭ আয়াত)

এ আয়াতে পোশাক নাযেল হওয়ার কথা বলা হয়েছে অথচ উহা পৃথিবীতেই তৈরী হয়।

৬। و انزلنا الحديد فيه بأس شديد (الحديد ٢٦)

বঙ্গানুবাদ ঃ আর আমরা লৌহ নাযেল করেছি যাতে ভীষণ যুদ্ধের উপকরণ আছে ...
(সূরা হাদীদ ঃ ২৬ আয়াত)

এ আয়াতে লোহার নাযেল হওয়ার কথা বলা হয়েছে অথচ উহা ভূগর্ভের খনি থেকে উৎপন্ন হয়।

কোন সহী হাদীসে ঈসা ইবনে মরিয়ম-এর জন্যে নুযূলের সাথে 'আকাশ' শব্দ বর্তমান নেই। কিন্তু যদি 'আকাশ' শব্দের উল্লেখও হতো তাহলেও এর অর্থ ইবনে মরিয়ম-এর মৃতঃ আসা মেরা যেত না। কেননা, ঈসা ইবনে মরিয়ম এর মৃত্যু কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। পরিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারাও ইহা বুঝা যায় যে, তিনি মূলতঃ অবতীর্ণ হবেন না। কেননা, আল্লাহ্তালা বলেছেন—'ফাইউমসিকুল্লাতী কাযা আলায়হাল মাওতা' অর্থাৎ যে রূহকে মৃত্যু দ্বারা কবয করে নেয়া হয়েছে, উহাকে খোদা আটকে রাখেন (সূরা যুমার ঃ ৪৩ আয়াত) অর্থাৎ দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে পাঠান না।

এভাবে প্রত্যেক বস্তু এবং বিশেষ করে 'প্রতিশ্রুত বস্তু' আকাশ থেকেই আগমন করে এই অর্থে যে, উহার প্রকাশে ঐশী-উপকরণের সম্মীলন ঘটে।

আল্লাহ্তা'লা বলেন :

'ফীস্ সামায়ে রিয্কুকুম ওয়ামা তু'আদূন' অর্থাৎ, আকাশে তোমাদের রিয্ক রয়েছে এবং ঐ সকল বস্তুও যাদের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। (সূরা যারিয়াত ঃ ২৩ আয়াত—অনুবাদক)

অতএব শেষ যুগে যে মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তিনিও এক হিসেবে আকাশ থেকেই অবতরণ করেছেন।

ইবনে মরিয়মের ক্ষেত্রে রূপকের জন্যে ব্যবহৃত সম্পর্কিত শব্দসমূহ ঃ

ইবনে মরিয়ম-এর প্রতিবিম্বিত অবতরণ সম্পর্কে মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরিপার্শ্বিক অবস্থা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীসেও পরিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া আছে যা কিনা 'ইমামুকুম মিনকুম' এবং 'ফা আম্মাকুম মিনকুম' 'ঈসাব্না মারিয়ামা ইমামান মাহদীয়ান' বাক্যগুলোর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আবার তিবরানীর হাদীসের এই বাক্যটিও রয়েছে—আলা ইন্নাহু খালীফাতী ফী উম্মাতী'—শুনে রাখ! নিশ্চয় তিনি আমার উম্মতের মধ্যে থেকে আমার খলীফা হবেন।

এসব হাদীসে ইহা উল্লেখিত হয়েছে যে, মসীহ মাওউদ (আঃ) উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ইমাম এবং নবী করীম (সাঃ)-এর খলীফা হবেন। কিন্তু হবেন উম্মতের মধ্য থেকেই।

বাইরের থেকে আসবেন না। কেননা, আয়াতে' ইস্তেখলাফ'-এর মধ্যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে যে, এই উম্মতের নেতা ও খলীফা উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন। অবশ্যই এ উম্মতের পূর্বে বিগত খলীফার সাদৃশ্য হবেন। অতএব হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে সাদৃশপূর্ণ কোন খলীফা তো আসতে পারেন স্বয়ং হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূলতঃ অবতরণ আয়াতে 'ইস্তেখলাফ'-এর আলোকে অসম্ভব ও নিষিদ্ধ। কেননা, তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও উপমিত হওয়া অবশ্যই জরুরী (যদি তিনি নিজে আসেন), যা কিনা অসম্ভব।

মসীহ্ (আঃ)-এর জীবিত থাকার ওপরে ইজমা' (সর্ববাদী সম্মত মত)-এর দাবী গ্রহণযোগ্য নয়:

উপরের আলোচনা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় যে, মসীহ্ (আঃ)-এর জীবন ও মরণের ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি ধারণা প্রচলিত আছে। এথেকে ইহা সুস্পষ্ট যে, মসীহ্ (আঃ)-এর জীবিত থাকার ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপরে উম্মতের মধ্যে কখনও ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যাইহোক যেভাবে আমরা ইহা প্রমাণ করে দিয়েছি যে, মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর ওপরে সাহাবায়ে কেরাম রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম আজমাঈনগণের ঐকমত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব মসীহ্ (আঃ)-এর মৃত্যুর ব্যাপারে ধর্মীয় বিশ্বাসই সর্ববাদীসম্মত মত হিসেবে দলীল বলে গণ্য হবার অধিকার রয়েছে। এভাবে ইবনে মরিয়মের অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও মুসলমানদের মধ্যে দু'টি ধারণা বিদ্যমান। একদল ইবনে মরিয়মের মূলতঃ অবতীর্ণ হওয়ার বিশ্বাসী আর অন্যদল প্রতিবিম্বাকারে আবির্ভাবে বিশ্বাসী। কারণ, হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর মূলতঃ আকাশ থেকে অবতরণের ইজমা' (সর্ববাদী সম্মতমত) প্রতিষ্ঠিত নয়।

কারণ, এপ্রসঙ্গে তফসীরকারগণের ব্যক্তিগত যে মতামত রয়েছে তা দলীল-প্রমাণ হিসেবে চূড়ান্ত বলে গণ্য হতে পারে না; কেবল মাত্র উহা ব্যতিরেকে যে, হানাফী ফেকাহ্-এর আলোকে আগামীতে সংঘটিতব্য বিষয়াদির ব্যাপারে যে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে সে প্রসঙ্গে কোন বিশেষ অর্থ এবং তাৎপর্যের ওপরে ইজমা' হতে পারে না। যেমন শেখ মুহিব্বুল্লাহ্ বিন আব্দুশ্ শুকুর স্বীয় 'মুসাল্লামুস্ সাবূত' নামক পুস্তকে লিখেছেন:

اما فی المستقبلات كاشراط الساعة وامور الاخرة فلا (اجماع) عند الحنفية لان
الغيب لاحد دخل فيه للا جتهاد - (مسلم الثبوت مع شرح ص ٢٤٠)

বঙ্গানুবাদ: অর্থাৎ, যেসব বিষয়াদি ভবিষ্যতের সাথে সম্পর্ক রাখে যেমন, কেয়ামতের চিহ্নাবলী, [যার মধ্যে ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর অবতরণও অন্তর্ভুক্ত-উদ্ধৃতিকার] এবং আখেরাতের বিষয়াবলী। এসব ব্যাপারে হানাফীদের মতে ইজমা' হতে পারে না। কেননা, অদৃশ্য বিষয়াবলীতে গবেষণা এবং মতামতের কোন প্রবেশাধিকার নেই।

(মুসাল্লামুস্ সাবূত মা'আ শরাহ্ পৃষ্ঠা-২৪০)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ)-বলেছেন :

"প্রতিশ্রুত মসীহের আকাশ থেকে অবতরণ একটি মিথ্যে ধারণা মাত্র। স্মরণ রেখ, যারা আজ জীবিত আছে, তারা সকলে মারা যাবে কিন্তু তাদের মধ্য থেকে কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। অতঃপর তাদের সন্তানেরাও মারা যাবে কিন্তু তাদের মধ্য থেকেও কেউ মরিয়মের পুত্র ঈসাকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না, অতঃপর সন্তানদের সন্তানেরাও মারা যাবে, কিন্তু তারাও মরিয়মের পুত্রকে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হতে দেখবে না। তখন খোদা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবেন যে, ক্রুশের প্রাধান্যের যুগও অতিবাহিত হয়েছে আর পৃথিবীর অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে, কিন্তু মরিয়মের পুত্র ঈসা (আঃ) এখনও আকাশ থেকে অবতীর্ণ হলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা এ বিশ্বাসের ওপরে একেবারেই বিতৃষ্ণ হয়ে পড়বে। অতঃপর আজ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পূর্ণ হবে না যখন ঈসা (আঃ)-এর অপেক্ষাকারীরা কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকলে অত্যন্ত হতাশ ও বিরক্ত হয়ে মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করবে। তখন পৃথিবীতে একটিই ধর্ম হবে (অর্থাৎ ইসলাম—অনুবাদক) এবং একই নেতা [অর্থাৎ মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)—অনুবাদক]। আমি তো একটি বীজ বপন করতে এসেছি। সুতরাং আমার হাত দ্বারা ঐ বীজ বপন করা হয়েছে। এখন ইহা বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বিকশিত হবে। কেউ ইহাকে প্রতিহত করতে পারবে না"।

(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন : ৯৫পৃষ্ঠা) (চলবে)

কালামুল ইমাম

"আমি তোমার ওপরে আশীষের পর আশীষ বর্ষণ করবো এমন কি রাজা-বাদশাহ্গণ তোমার কাপড় থেকে কল্যাণ অন্বেষণ করবে।" সুতরাং তোমরা যারা শ্রবণ করছো! এ কথাগুলো মনে রেখ এবং এ ভবিষ্যদ্বাণীগুলো তোমরা সিন্দুকে আবদ্ধ করে রাখো, কেননা, ইহা আল্লাহ্তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবেই।"

"ইসলাম ব্যতিরেকে সর্বপ্রকার বিশ্বাস বিনাশ প্রাপ্ত হবে। সকল অস্ত্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হবে কেবল ইসলামের ঐশী অস্ত্র ব্যতিরেকে যা ভাঙ্গবেও না এবং ভোঁতাও হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের শক্তিকে ভস্মীভূত করে। সময় ঘনিয়ে এসেছে যখন প্রকৃত তৌহীদ (একত্ববাদ) সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে এমন কি মরুভূমির অজ্ঞ অধিবাসীরাও তাদের হৃদয়ে তা অনুভব করবে"।

[হযরত ইমাম মাহদী (আঃ), তবলীগে রিসালত : ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ-৮]

এম, টি, এ, ডাইজেস্ট

(২৬-২৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৬)

সংকলন—আবদুল্লাহ শামস্ বিন তারিক

জুমুআর খুৎবায় 'লাইলাতুল মুবারক'-এর তাৎপর্য এবং রমযানের কল্যাণসমূহকে স্থায়িত্ব দানের উপর আলোচনা :

১৬ই ফেব্রুয়ারীর খুৎবায় সূরা দুখানের প্রথম কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর (আইঃ) বলেন, এখানে বলা হয়েছে যে, কুরআনকে এক মোবারক (কল্যাণময়) রাত্রিতে অবতীর্ণ করা হয়েছে বা এভাবেও অনুবাদ করা যেতে পারে যে, এক মোবারক রাত সম্পর্কে অবতীর্ণ করা হয়েছে। হুযুর (আইঃ) উল্লেখ করেন যে, সূরা বাকারায় বলা হয়েছে রমযান মাসে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বা রমযান সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা। প্রথম অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতদ্বয় পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। তাই এরূপ অর্থ করাই অধিকতর যুক্তি সঙ্গত যে, রমযানের বা এক মোবারক রাত্রির পবিত্র পরিবর্তনসমূহ সম্পর্কেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

এই মোবারক রাত্রি কী ? এর ব্যাখ্যায় হাদীস ও হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে হুযুর (আইঃ) বলেন যে, নবীদের আগমনের যুগকে লাইলাতুল মুবারক বা লাইলাতুল কদর বলা হয়েছে। আবার প্রত্যেক মানুষের নিজ জীবনের পবিত্র পরিবর্তনের সময়কে বা তওবার কবুলিয়্যাতের সময়কেও একই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী ছিল রমযানের পরে প্রথম খুৎবা। হুযূর (আইঃ) এ খুৎবায় বলেন যে, প্রত্যেকেরই নিজ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা আছে আল্লাহ্ তা'লার 'নূর' লাভ করার—তা কম হোক কিংবা বেশী। ঐ ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য বিগত রমযান যার জন্য অতিক্রান্ত অথচ তার অন্তর পূর্বের ন্যায় অন্ধকারই রয়ে গেছে।

হুযূর (আইঃ) আরো বলেন যে, অনেকের ক্ষেত্রে হয়তো এরূপ হচ্ছে যে, রমযান তাদের জন্য যে কল্যাণসমূহ বয়ে এনেছিল এ অল্প সময়েই তা তাদেরকে ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। কোন সুঅভ্যাসের সৃষ্টি এবং কোন মন্দ অভ্যাস হতে সংযম এগুলো রমযান যেতে না যেতেই পলায়ন করছে। এখনো সময় আছে এগুলোকে আঁকড়ে ধরার। এভাবে এক রমযানের কল্যাণসমূহের অন্ততঃ কিছু অংশকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নেয়া প্রয়োজন।

ঈদের খুৎবায় দুই ব্যক্তিকে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাপড়ের টুকরো উপহারস্বরূপ প্রদান :

যুক্তরাজ্যের ইসলামাবাদে ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রদত্ত ঈদের খুৎবাটি এর কয়েক ঘন্টা পরে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এম, টিতে সম্প্রচার করা হয়। এদিন এম, টি-এর ছবি এবং শব্দ ছিল খুবই অস্পষ্ট। এজন্য খুৎবা বুঝতে বেশ অসুবিধা হয়। হুযুর (আইঃ) কুরআন

হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর অবতীর্ণ ইলহামসমূহের আলোকে ঈদের তাৎপর্য আলোচনা করেন।

খুৎবার শেষ প্রান্তে হুযুর (আইঃ) এম, টি, এ-র নতুন যে ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ চালু হবে সেজন্য অসাধারণ পরিশ্রমকারী দুই ব্যক্তির উল্লেখ করেন। হুযূর (আইঃ) এক পর্যায়ে মসীহ মাউওদ (আঃ)-এর সেই ইলহামের উল্লেখ করেন যাতে বলা হয়েছে, "বাদশাহ-গণ তোমার বস্ত্র হতে কল্যাণ অনুসন্ধান করবে।" এরপর হুযূর (আইঃ) খুৎবার মধ্যেই দুই ব্যক্তির হাতে বাঁধাইকৃত দু'টি ফলক তুলে দেন যেগুলোতে মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর কাপড়ের টুকরো সংযুক্ত ছিল বলে মনে হয়। এ দুই ব্যক্তি এম, টি, এ-র জন্য অসামান্য খেদমতকারী দুই ব্যক্তিই ছিলেন নাকি কোন রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি ছিলেন তা সঠিক বুঝা যায়নি।

পরিশেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সকলকে ঈদ মোবারক ও সালাম জানান।

রমযানের দরস ও ইজতেমায়ী দোয়া:

রমযানের শেষভাগে হুযুর (আইঃ) সূরা নিসার দ্বিতীয় রুকূতে বর্ণিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও বন্টনের নীতিমালার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। দরসে কুরআনের শেষ দিনে প্রথা অনুযায়ী তিনি কুরআন মজীদের শেষ তিন সূরার দরস প্রদান করেন। এরপর ইজতেমায়ী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এ দোয়াতে উপস্থিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও বিশ্বব্যাপী মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার দর্শকগণ অংশগ্রহণ করেন।

এম, টি, এ, বাংলাদেশ-এর তৈরী ঈদের অনুষ্ঠান:

২৬শে ফেব্রুয়ারী রাত প্রায় সোয়া নয়টায় এম, টি, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তৈরী ঈদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। মোহতারম ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবের উপস্থিতি অনুষ্ঠানটির শোভা বর্ধন করে। ঈদ সম্পর্কে আমীর সাহেবের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ছাড়াও আতফাল ও নাসেরাত কবিতা, নযম, বক্তৃতা, সমবেত সঙ্গীত প্রভৃতি পেশ করে। অনুষ্ঠান শেষে ন্যাশনাল আমীর সাহেব সারা বিশ্বে বসবাসরত আহমদী ভাই-বোনদের নিকট বাংলাদেশ জামাতের পক্ষ থেকে 'ঈদ মোবারক' জানান।

হুযূর (আই) কর্তৃক মোঃ ফিরোজ আলম সাহেবের কুরআন তেলাওয়াতের প্রশংসা:

২৪শে ফেব্রুয়ারী হুযুর (আইঃ)-এর সাথে ছোটদের ক্লাসের শুরুতে বাংলাদেশ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার সাবেক সদর মোহাম্মদ আবদুল হাদী সাহেবের কন্যা সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করলে হুযূর (আইঃ) তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন যে, যে সূরে তেলাওয়াত করা হবে সেটি কেবল বাংলাদেশেই ব্যবহৃত করা হয়। মেয়েটি আস্তে করে মৌলানা সাহেবের নাম উচ্চারণের চেষ্টা করলে হুযুর (আইঃ) বলেন, "আমি জানি, এটা ফিরোয আলম (-এর সূর)।" তিনি আরো বলেন যে, রমযানে এ তেলাওয়াত এম, টি, এ-তে বার বার প্রচার করা হয়েছে এবং "তা সকলকে মুগ্ধ করেছে (enchanted all)"।

পরিচালক—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

ফুল
(গুল)

(সাত থেকে দশ বছর বয়সের ওয়াকফে নও বালক-বালিকাদের জন্যে তালীম তরবীয়তি পাঠ্যক্রম)

মূল—আমাতুল বারী নাসের

(সপ্তম কিস্তি)

৩১। ওয়া ইয্ কালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতে [এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রভু ফিরিশ্তাদের উদ্দেশ্য করে বল্লেন,] ইন্নী জায়েলুন ফিল আরযে খলীফাতান [নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে এক খলীফা (প্রতিনিধি) নিযুক্তকারী] কালু আতাজ'আলু ফীহা [তারা বল্ল, তুমি কি এতে (এমন কাউকে) নিযুক্ত করবে ?] মাই'উফসিদু ফীহা (যে এতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে) ওয়া ইয়াসফিকুদ্দিমায়া (এবং রক্তপাত করবে) ওয়া নাহনু (অথচ আমরা) নুসাব্বিহু বেহামদিকা (আমরা প্রশংসাসহ গুণকীর্তন করছি তোমার) ওয়া নুকাদ্দিসু লাকা (এবং আমরা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি) কালা ইন্নী আ'লামু (তিনি বল্লেন, নিশ্চয় আমি সবচে' অধিক জানি) মা লা তা'লামূন (যা তোমরা জান না)।

৩২। ওয়া 'আল্লামা আদামাল আসমায়া কুল্লাহা (আর তিনি আদমকে শিখালেন যাবতীয় নাম) সুম্মা 'আরাযাহুম 'আলাল মালাইকাতে (অতঃপর ফিরিশ্তাগণের সম্মুখে উহাদেরকে উপস্থাপন করলেন) ফাকালা আম্বেউনী (অতঃপর তিনি বল্লেন, তোমরা আমাকে বলো) বিআসমায়ে হাউলায়ে (এগুলোর নাম) ইন কুনতুম সাদেকীন (যদি তোমরা সত্যবাদী হও)।

৩৩। কালু সুব্হানাকা (তারা বল্লো', তুমি পবিত্র ও মহান) লা ইলমালানা (আমাদের কোন জ্ঞান নেই) ইল্লা মা আল্লামতানা (যা তুমি আমাদেরকে শিখিয়েছ তা ব্যতিরেকে) ইন্নাকা আনতাল 'আলীমুল হাকীম (নিশ্চয় তুমিই সর্বজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাময়)।

৩৪। কালা ইয়া আদামু (তিনি বল্লেন, হে আদম !) আম্বে'হুম বে আসমায়িহিম (তুমি তাদেরকে উহাদের নাম বলে দাও) ফালাম্মা আম্বায়াহুম বে আসমায়িহিম (অতঃপর যখন সে তাদেরকে উহাদের নামগুলো বলে দিল) কালা আলাম আকুল্লাকুম [তিনি (আল্লাহ্) বল্লেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি ?] ইন্নী আ'লামু গায়বাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযি (নিশ্চয় আমি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর গোপন রহস্যাবলী সম্বন্ধে অবগত আছি) ওয়া আ'লামু মা তুবদূনা (আর জানি সব বিষয়ে যা

তোমরা প্রকাশ কর) ওয়ামা কুনতুম তাকতুমূন (আর যা তোমরা লুকিয়ে রাখ)।

৩৫। ওয়া ইয্ কুলনা লিল মালাইকাতিসজুদূ [এবং (সেই সময়কে স্মরণ করো) যখন আমরা ফিরিশ্তাগণকে বল্লাম, তোমরা (আনুগত্যের)] সিজদা করো) লে আদামা (আদমকে) ফাসাজাদূ (অতএব তারা সিজদা করলো) ইল্লা ইবলীস (কেবল ইবলীস ব্যতিরেকে) আবা ওয়াসতাকবারা (সে অস্বীকার করলো ও অহংকার করলো) ওয়া কানা মিনাল কাফেরীন (প্রকৃতপক্ষে সে ছিলো কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত)।

৩৬। ওয়া কুলনা ইয়া আদামু (আর আমরা বল্লাম, হে আদম !) উসকুন আনতা ওয়া যাওজুকাল জান্নাতা (তুমি ও তোমার স্ত্রী এ বাগানটিতে বসবাস করো) ওয়া কুলা মিনহা রাগাদান (এবং তোমরা উভয়েই উহা থেকে তৃপ্তি সহকারে খাও) হায়সু শি'তুমা (যেখানে তোমাদের ইচ্ছা) ওয়ালা তাকরাবা হাযিহিশ্ শাজারাতা (কিন্তু তোমরা দু'জনে এ গাছটির নিকটে যেয়ো না) ফাতাকূনা মিনায্ যোয়ালেমীন (নচেৎ তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে)।

৩৭। ফা আযাল্লাহুমাশ্ শায়ত্বানা 'আনহা (কিন্তু শয়তান উহা দ্বারা তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো) ফা আখরাজা হুমা মিম্মা কানা ফীহে [অতঃপর তাদের উভয়কে উহা (অবস্থান) হতে বের করে দিলো যাতে তারা ছিলো] ওয়া কুলনাহ্বেত্ (তখন আমরা বল্লাম, তোমরা সকলে চলে যাও) বা'যুকুম লেবা'যিন 'আদুবুন (তোমরা একে অপরের শত্রু) ওয়া লাকুম ফিল আরযে (এবং তোমাদের জন্যে রয়েছে এ পৃথিবীতে) মুসতাকাররুন ওয়া মাতা'উন [বসবাসের স্থান ও জীবিকা নির্বাহের উপকরণ (নির্ধারিত) আছে] ইলা হীন [এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত]।

৩৮। ফাতালাক্বা আদামু মির্ রাব্বিহী কালিমাতিন [অতঃপর আদম তার প্রভুর নিকট থেকে শিখে ফেল্ল কতিপয় (দোয়া বিষয়ক) বাক্য (এবং তদনুযায়ী দোয়া করল)] ফাতাবা আলায়হে (ফলে তিনি তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন) ইন্নাহু হুয়া ত্তাওওয়াবুর রাহীম (নিশ্চয় তিনিই পুনঃ পুনঃ সদয় দৃষ্টিপাতকারী, পরম দয়াময়)।

৩৯। কুলনাহ্বেত্ মিনহা জামী'আন (আমরা বল্লাম, তোমরা সকলে এখান থেকে চলে যাও) ফা ইম্মা ইয়া'তিয়ান্নাকুম মিন্নী হুদান (অতঃপর যখনই আমার তরফ থেকে তোমাদের নিকট কোন হেদায়াত আসে) ফামান তাবে'আ হুদায়া (তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে) ফালা খাওফুন আলায়হিম ওয়ালা হুম ইয়াহ্যানূন (সেক্ষেত্রে তাদের কোন ভয় থাকবে না আর তারা দুঃখিতও হবে না)।

৪০। ওয়াল্লাযীনা কাফারু (আর যারা অস্বীকার করেছে) ওয়া কায্যাবূ বে আয়াতিনা (এবং আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে) উলাইকা আস্হাবুন্নার (এসব লোকই আগুনের অধিবাসী) হুম ফীহা খালিদূন (সেখানে তারা বসবাস করতে থাকবে)। ৪র্থ রুকু

(চলবে)

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সা:)-এর জলসা

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, পটুয়াখালী, খাগদন ও দুর্গারামপুর যথাক্রমে ১২-২-৯৬, ৪-৩-৯৬ ও ১০-৩-৯৬ তারিখ আমাদের প্রিয় নবী মহানবী (সা:)-এর পবিত্র জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে। এতে অনেক অ-আহমদীও উপস্থিত ছিলেন।

মসীহ মাওউদ (আ:) দিবস পালিত

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও ২৩শে মার্চ তারিখে অতীব শান-শওকত ও ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জামাতে মসীহ্ মাওউদ (আ:) দিবস পালিত হয়। এ পর্যন্ত যে সব জামাত থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেছে সেগুলো হলো—ঢাকা, ক্রোড়া, ঘাটুরা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, তেরগাতি, চান্দপুর চা বাগান, কুমিল্লা, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, জামালপুর (নোয়াপাড়া) ও বিষ্ণুপুর।

০ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হতে ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার আয়োজনে বার্ষিক তালীম ও তরবীয়তী ক্লাস সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে খোদ্দাম উপস্থিত ছিলেন ২৪ জন ও তিফল ছিলেন প্রায় ৯০জন।

০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া সুন্দরবনের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদের দিন আহমদী, অ-আহমদী ও হিন্দুদের বাড়ীতে যাওয়া হয় এবং সকল বাচ্চাদের মিষ্টি খাওয়ানো হয় এবং সকলের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়।

০ সুন্দরবন মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ১-২-৯৬ থেকে ৫-২-৯৬ইং বিকাল ৩টার সময় বিভিন্ন হালকায় মুমূর্ষু রোগীদের সাথে কুশল বিনিময় সহ তাদের মাঝে কিছু ফলমূল বিতরণ করা হয়। কায়েদ সহ ২০ জন খোদ্দাম এ কাজে অংশ গ্রহণ করে।

০ মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া ক্রোড়ার উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদ এবং বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

শোক সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জামাতের মোসাম্মাৎ মিনারা বেগম (বয়স ৫২ বৎসর স্বামী শেখ মতিউর রহমান কান্দিপাড়া, উত্তর আহমদী পাড়া) গত ২২-৩-৯৬ ইং রোজ শুক্রবার সকাল ৭-০০ ঘটিকায় ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)। তিনি দীর্ঘদিন ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে মরহুমা স্বামী, ২ ছেলে, ৩ মেয়ে, নাতী-নাতীসহ জামাতের অনেক গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি লাজনার একজন একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে ও পরিবারকে আল্লাহ্তা'লা যেন সাবরে জামিল দান করেন সেজন্যে সকল আহমদী ভাইবোনের নিকট এই দোয়া কামনা করছি। শেখ মোশারফ হোসেন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত নিউ সোনাতলার প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আক্কেস আলী সাহেবের স্ত্রী মোসাম্মৎ মুর্শেদা বেগম (৫০) গত ৫/৪/৯৬ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ ফজর ৬-১৫ মিনিটে নিজ বাসগৃহে পরলোক গমন করেন, (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন)

মৃত্যুকালে মরহুমা ৪ মেয়ে ও ১ ছেলে রেখে গেছেন। তার রুহের মাগফেরাতের জন্যে সকল ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। মোহাম্মদ আলী, নিউ সোনাতলা

পদ খালি

রিউ ফার্মা ক্যামিক্যাল কোং (আয়ুর্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান) এর বিভিন্ন প্রকার ঔষধ বিক্রয় ও বাজারজাত করার জন্য কিছু শিক্ষিত বিক্রয় প্রতিনিধি জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা হইবে।

	পদের নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদের সংখ্যা	বেতন স্কেল
ক)	বিক্রয় প্রতিনিধি	এস, এস, সি (সমমান)	১৫(পনর) জন	৩৫০০/- সর্বমোট
খ)	সাধারণ কর্মচারী	৫ম পঞ্চম শ্রেণী পাশ	১০ (দশ) জন	১৫০০/- ,,
		পুরুষ/মহিলা		
গ)	অফিস পিয়ন	৮ম শ্রেণী পাশ	০১ (এক) জন	১২০০/- ,,
ঘ)	নিরাপত্তা প্রহরী	৮ম শ্রেণী পাশ	০১ (এক) জন	১৫০০/- ,,
ঙ)	ডেলীভারীম্যান	৮ম শ্রেণী পাশ	০৫ (পাঁচ)জন	১৫০০/- ,,
চ)	এজেন্সীর পাইকারী বিক্রেতা	যোগ্যতানুযায়ী	৩০(ত্রিশ)জন	কমিশন পাবেন।

শর্তাবলী

১। সকল আগ্রহী প্রার্থীগণের দরখাস্তের সংগে ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল কপি আনিতে হইবে।

২। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

৩। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নাই। নিয়োগ প্রাপ্তির পর প্রতিনিধিদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাবস্থা আছে।

৪ অফিস চলাকালীন সময় সকল ৮ (আটটা) হইতে বিকাল ৪ (চার) টার মধ্যে যোগা-যোগ করিতে হইবে।

৫। কোম্পানীর দরখাস্তের ফরমে অবশ্যই দরখাস্ত করিতে হইবে।

৬। সাক্ষাৎকারের জন্য কোন যাতায়াত খরচ ও অন্যান্য ভাতা দেওয়া হইবে না।

৭। প্রতি পদের জন্য আলোচনা সাপেক্ষে জামানত দিতে হইবে।

৮। যোগাযোগের ঠিকানা নিম্নে বর্ণিত হইল।

যোগাযোগের ঠিকান :
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
রিউ ফার্মা কেমিক্যাল কোং
৪১৮ নং ডাক্তার শেফালী বাজার
৪র্থ তলা বিল্ডিং এর নিচ তলা
নয়াপাড়া, পূর্ব ধনীয়া
ডেমরা, ঢাকা

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবুবকীম

প্রশ্ন : মৌল এবং মৌলবাদে পার্থক্য কি ?

উত্তর : সমাজ এবং সমাজবাদে, সাম্য এবং সাম্যবাদে যে পার্থক্য মৌল এবং মৌলবাদেও তেমনি পার্থক্য। একটি উপমা দিচ্ছি। আঙ্গুর মূল বা মৌল বস্তু, এই আঙ্গুর যখন পরিবর্তিত হয় তখন তা হয় মদ। অতএব আঙ্গুর হল মৌল এবং মদ হল মানুষের হস্তক্ষেপে আঙ্গুরের বিকৃত রূপ, যাকে আমরা মৌলবাদের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। মৌলবিষয় নিয়ে 'বাদ' বা 'ইজম' সৃষ্টি করলে তা মৌলিকতা হারায়, জন্ম নেয় মৌলবাদ।

প্রশ্ন : হিন্দুরা কর জোড়ে প্রার্থনা করে আর মুসলমানরা কর বা হাত বিস্তারিত করে দোয়া করে। এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক ?

উত্তর : কর জোড় থেকে হাত দু'টিকে একটু ফাঁক করলেই মুসলমানদের প্রার্থনা পদ্ধতি হয়। কর জোড় অবস্থাটি যদি ফুলের কলির মত হয় তাহলে কর ফাঁক করাকে আমরা প্রস্ফুটিত ফুলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। কলি আর ফুল যেমন এক তেমনি এই দুই পদ্ধতির প্রার্থনাও এক। তবে একটি অপূর্ণ ফুলের মত অপরটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত ফুলের মত। ধর্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন প্রার্থনা পদ্ধতিও পূর্ণতা লাভ করে।

প্রশ্ন : 'যত মত তত পথ' কথাটা কি ঠিক ?

উত্তর : হ্যাঁ, ঠিক। মত ভিন্ন হলে পথও ভিন্ন হবে। মানুষের কল্পনাপ্রসূত মত এক রকম নয় তাই তাদের পথও এক নয়। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র যেমন এক নয়, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মৌলবাদ যেমন এক নয় তেমনি ভিন্ন ভিন্ন মতও এক প্রকার নয়। তবে সর্বযুগে, সর্বকালে নবী-রসূল, অবতার-ঋষিদের ধর্ম মত একই। নবী-অবতাররা ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচার করে মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে আসেন নি। তারা একমাত্র সত্য সনাতন ধর্মকে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী প্রচার করে মানব জাতিকে একই মার্গে বা পথে পরিচালিত করে গেছেন। এই পথ সঠিক ও সহজ পথ। এক কথায় মানুষের কল্পনায় সৃষ্ট মত ও পথ বিভিন্ন। আর স্রষ্টার প্রদর্শিত মত ও পথ একই মত এবং একই পথ। সিরাতাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম—পুরস্কার প্রাপ্তদের একমাত্র সিদ্ধ পথ।

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)। যখন তিনি তাঁর পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলেন তখন আল্লাহ্‌র আদেশে তাঁকে কুরবানী করার জন্যে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) প্রস্তুত হয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ বললেন, তোমার স্বপ্ন তুমি বাস্তবায়িত করেছ। তিনি যবাই করলেন না অথচ কীভাবে তা পূর্ণ করলেন, তা আমাদের ভেবে দেখার অবকাশ আছে। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) তাঁর 'এক-অদ্বিতীয়' পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে শিশু বয়সেই আল্লাহ্‌র আদেশে মক্কার নিবিড় অরণ্যে তার মাতা হযরত হাজেরা সহ পরিত্যাগ করেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সেখানে কা'বা ঘরের সংস্কার হ'ল এবং মক্কা নগরীর হ'ল প্রতিষ্ঠা। আর সেখানে তাঁদের বংশে আবির্ভূত হলেন বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। এজন্যে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) থেকে কুরবানী গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর এ কুরবানীকে দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত করার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা স্বপ্নে এই আদেশ দিলেন আর অমনি হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ) 'আসলামত লি রাব্বিল আলামীন' বলে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান কুরবানীর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হল দুনিয়াতে।

হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর এই কুরবানীর রূহ এবং শক্তিকে নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করার জন্যে বিশ্বের প্রতিটি মুসলমান ভাই প্রত্যেক বছর পশু কুরবানী করে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) যেভাবে পিতার ছুরির নীচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কুরবানীর পশু যেভাবে ছুরির নীচে মাথা পেতে দেয় তেমনি প্রতিটি মুসলমানের এই প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত যেন ইসলামের পথে তারা নিজেদের এভাবে কুরবানী করে দিতে পারে। আবার কুরবানীর পশুর মত নিজেদের পশুত্বকে বলি দেয়ার শিক্ষাও আমরা কুরবানী থেকে পেয়ে থাকি। কেবল গোশ্‌ত খাওয়াই এই কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। স্বয়ং আল্লাহ্‌তা'লা নিজেও স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন— লাইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়া লাকিইয়ানালুহু তাক্‌ওয়া মিনকুম অর্থাৎ উহাদের মাংস ও উহাদের রক্ত কখনও আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না, বরং তাঁদের নিকট তোমাদের তরফ হতে তাক্‌ওয়া পৌঁছে—(সূরা হাজ্জ : ৩৮) সুতরাং ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী কুরবানী পালনের দ্বারা প্রতি বছর মুসলিম নিজেদের মধ্যের তাক্‌ওয়াকে আর একবার ঝালিয়ে নেন যেন প্রয়োজনের দিনে আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর পশুর ন্যায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

ঈদ ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

আসছে পবিত্র ঈদুল আযহিয়া ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। হযরত ইব্‌রাহীম আলায়হেস সালামের মহান কুরবানীর প্রেরণা সকলকে উজ্জীবিত করুক এ কামনা করছি।

পাক্ষিক আহ্‌মদী ব্যবস্থাপনা

সম্পাদকীয়

২রা বৈশাখ, ১৪০৩ বাং, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৬ ইং

কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য

কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য না বুঝার কারণে কেউ কেউ কটূক্তি করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরবানী একদিকে যেমন অপচয় অর্থাৎ একদিনে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ পশু যবাই করে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের ঘাটতি সৃষ্টি করা হচ্ছে অন্য দিকে একটা অবোধ পশুকে আল্লাহ্‌র নামে নৃসংশভাবে হত্যা (!) করার ফলে আর একজনের পুণ্যের হাঁড়ি ভরতি হচ্ছে। আপাতঃ দৃষ্টিতে উপরোক্ত উক্তি সঠিক বলে মনে হলেও গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে ইহা বোকার উক্তি বলে প্রতীয়মান হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আল্লাহ্ যে বস্তুকে হালাল (বৈধ) করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বরকত (প্রবৃদ্ধি)ও রেখে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই গরু, ছাগল প্রভৃতির বাৎসরিক বাচ্চা উৎপাদনের হার কুকুর, শূকর ইত্যাদির চাইতে অনেক কম। কুরবানী এবং মাংস-নিষেধ-দিবস বাদে (Meat less day) প্রতিদিন বিশ্বে লক্ষ লক্ষ গরু, ছাগল ইত্যাদি যবাই হচ্ছে। তবুও আমরা দেখতে পাই পশু-পালকের পালান নিঃশেষ হয় না। অথচ বছরে বহুগুণে কুকুর ও শূকর পয়দা হলেও (মুসলমানের জন্যে এগুলো যদিও নিষিদ্ধ) তাদের সংখ্যা তুলনামূলক কমই দেখা যায়। রাস্তাঘাট তো কুকুর শূকর প্রভৃতিতে ভরতি থাকার কথা। যেভাবে গরু, ছাগল প্রভৃতি খাওয়া হয় যদি আল্লাহ্ এগুলোতে বরকত না দিতেন তাহলে এ প্রজাতিগুলো বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিত।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই 'বড়'র বাঁচার জন্যে 'ছোট' সব সময় আত্মবলি দিচ্ছে। ছোট মাছ বড় মাছের জন্যে জীবন দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি পশুরা ছোট ছোট নিরীহ প্রাণী খেয়ে বেঁচে যাচ্ছে। যারা অতি দরদ দেখিয়ে গরু-ছাগল যবাই করার ব্যাপারে কটূক্তি করেন তাদেরকে যদি জিজ্ঞেসা করা যায় যে, জীব হত্যা করতে পারবেন না, তাহলে কি তারা বাঁচবেন। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, গাছ লতা-পাতারও জীবন আছে। এদের ওপরে তারা আমরা সবাই নির্ভরশীল। তাদের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে প্রতি মুহূর্তে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে অসংখ্য জীবাণু/ভাইরাস আত্মবলি দান করছে, তা কি তাদের জানা আছে? প্রকৃত কথা এই যে, 'ক্ষুদ্র'র আত্মত্যাগের মাধ্যমেই 'বৃহৎ'-এর জীবন আর এর মধ্যেই 'ক্ষুদ্র'র জীবনের সার্থকতা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা তাই তার সেবায় জীব-জন্তু, বৃক্ষ, তরুলতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নিয়োজিত। তাদের আত্মবলি দানে মানব জীবন বাঁচে, এবং তাদের জীবনও হয় সার্থক। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এর ব্যতিক্রম হলে দুনিয়া অচল হয়ে যেত। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে যে কুরবানী বা ত্যাগের শিক্ষাই প্রতি-নিয়ত কাজ করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

(অবশিষ্টাংশ ৭০ পাতায় দেখুন)

لا اله الا الله محمد رسول الله

MUSLIM TV AHMADIYYA
INTERNATIONAL

মুসলিম টেলিভিশন আহ্‌মদীয়া পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশে নানা ভাষায় ইসলাম প্রচার করছে। প্রতি শুক্রবার নিখিল বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে শুনতে পাবেন।

আহ্‌মদীয়ত সম্বন্ধে জানতে হলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্‌শী বাজার রোড
ঢাকা-১২১১

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272